বাঙালীর সমাজচিন্তা

রাজা রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ

ডঃ ফুলরেণু গুহ
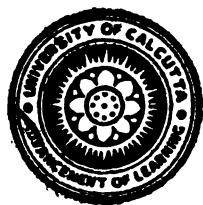
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৩

মূল্য—ছয় টাকা

সূচী-পত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙালীর উত্তাল চিন্তাতরঙ্গ বাংলার তথা ভারতের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্পর্কে অনুধ্যান করবার এবং আলোচনা করবার সুযোগ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। একপাশে অন্ধকার, বিপরীত পার্শ্বে অত্যুজ্জ্বল আলোক-শিখা—একদিকে অন্ধতা, মূঢ়তা আর অর্থহীন লোকাচারের নাগপাশ বাঁধন, অপরদিকে একের পর এক মহামানবতার বিপুলবিকাশ—আলো আঁধারের এই বৈচিত্র্যময় খেলাই জাতীয় জীবনের এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে তাঁরা আমাকে সেই চমকপ্রদ পরিচ্ছেদ ক'টি পর্যালোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন। এ লেখা লিখতে সাহায্য করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই—শ্রীজ্যোতি সেন, শ্রীঅঞ্জলি বসু ও শ্রীবেলা দাশগুপ্তকে।

রাজা রামমোহন রায় যে আলোক বর্তিকায় অগ্নি সংযোগ করলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বীয় করুণার তৈলধারায় সিক্ত রেখে সে দীপশিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করলেন আর সমগ্র মানবজাতির অজ্ঞতা ভীরুতা এবং জড়তার তমিস্রা দূর করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাকে বহন করে নিয়ে দিক থেকে দিকে দেশ থেকে দেশে সিংহবিক্রমে পরিক্রমা করে ফিরলেন।

এই জন্য এই অর্ধশতোত্তর শতাব্দীকালে বাঙালীর চিন্তাধারার গতি অনুসরণ করতে গেলে, তার ভাবনারাজ্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে এই ক্ষণজন্মা ত্রয়ীপুরুষের আবির্ভাব লগ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের জীবন আলেখ্যর সংগে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন তাঁদের জীবন আদর্শের ধারণা করা।

ফুলরেণু গুহ

বাঙালীর সমাজচিন্তা

[রাজা রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ]

প্রথম অধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীকে একটি যুগ পরিবর্তনের কাল বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের সূচনা হয় বাংলা দেশে। নব ভারতের স্রষ্টা যে সব মনীষীরা এই সময় বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, চিন্তা, কর্মধারা ও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যাঁরা নতুন আলো, নতুন পথের সন্ধান এনেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে অগ্রণী।

বর্তমান ইতিহাসের সেটা ছিল তমসাবৃত যুগ। প্রাচীন সমাজ, পুরাতন শাসন ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রায় হয়ে এসেছে, সেই ভগ্নস্তূপকে অপসারিত করে, প্রাচীন শাশ্বত ভিত্তির উপর নতুন করে দেশকে গড়ে তোলবার কোন প্রচেষ্টা নেই। অর্থহীন আচারের গোঁড়ামী, ভিত্তিহীন অন্ধবিশ্বাস, জড়তা এবং মূঢ়তা সমগ্র জাতির প্রাণস্রোতকে রুদ্ধ করে রেখেছে। চিন্তার জগতে, সৃজন-শীলতার লোকে বিরাজ করছে অন্ধকার ও ঊষরতা। এমন যুগে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

দেখা যায় কোন মহামানবকে কেন্দ্র করেই মহাকালের অদৃশ্য সৃজনী শক্তি মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় গঠনের কাজে মূর্ত হয়ে ওঠে। আপন যুগের অন্তর্নিহিত প্রধান সমস্যা কি, প্রধান চাহিদা কি তা উপলব্ধি করা, ইতিহাসের পটভূমিকায় সেই প্রয়োজনের স্থান নির্ধারণ করা এবং তারপর আপন চিন্তা, সৃজনশীলতা, কর্ম ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান এবং চাহিদার পূরণ করার সাফল্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে ওঠে যুগ প্রবর্তক, মহান্ নেতার মহত্ত্ব ও সার্থকতা। সেদিনের জগতে রামমোহনই একমাত্র মানুষ যিনি পরিপূর্ণরূপে আধুনিক যুগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন জগতে সভ্যতার থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আমাদের মঙ্গল নেই। চিন্তা ও কর্মজগতে

ব্যক্তিগত এবং জাতিগতভাবে পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের অগ্রগতির সম্ভাবনা। তাঁর এই ধ্রুব বিশ্বাসকে তিনি তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনাকে কোন পার্থিব প্রলোভন বা প্ররোচনা বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর সারাজীবনই তাঁর সাধনার প্রতীক।

তিনি বুঝেছিলেন ভারতের প্রকৃত সমস্যা কোথায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী-ধরে পৃথিবীর নানা অংশ থেকে নানা জাতের লোক এখানে এসেছে, তারা ক্রমশঃ এদেশবাসী হয়ে গেছে, এই দেশকে আপনার করে নিয়েছে। "যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হ'ল ভারতবর্ষের সর্ব প্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়।" তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন এই ঐক্য সাধনা কতো দুরূহ কিন্তু এই ঐক্যের মধ্যে দিয়ে ছাড়া ভারতের রক্ষা পাবার আর কোন পথ নেই।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রামমোহনের মাতা তারিণীদেবী ফুলঠাকুরাণী নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী এবং দৃঢ়চরিত্রের মনস্বিনী নারী ছিলেন। রামমোহন তাঁর এই গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

রামমোহনের পিতৃকুলের অনেকেই মুসলমান রাজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। এই সময় আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার বিশেষ আদর ছিল এবং রাজ সরকারে কাজ করতে হলে এই ভাষার জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শৈশবে রামমোহন গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন এবং একজন মৌলভীর কাছে তাঁর ফারসী ভাষা শিক্ষা সুরু হয়। যখন তাঁর মাত্র নয়-দশ বৎসর বয়স, তখন তাঁর বাবা তাঁকে শিক্ষার জন্য পাটনায় পাঠান। সে সময় পাটনার ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে কিছু প্রসিদ্ধি ছিল এবং সেখানে বিদ্যাচর্চার সুযোগ-সুবিধাও ছিল। পাটনাতে থেকে রামমোহন ভাল করে আরবী ও ফারসী ভাষা শেখেন এবং আরবী ভাষায় অনুদিত য়ুক্লিড ও অ্যারিস্টটল পাঠ করেন। এ ছাড়া তিনি গভীরভাবে কোরাণ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।

ইসলামের দর্শন এবং সুফীদের মুতাজিল শাখার ধর্মমতের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদ ও যুক্তিবাদ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পাটনা থেকে ফেরার

পর তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও প্রচলিত কুসংস্কারাবলীর নিন্দা করে ফারসী ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। তখন তাঁর মাত্র ষোলো বৎসর বয়স। এই ঘটনা তাঁর পরিবারের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পিতার সংগে এই নিয়ে গভীর মনান্তর হয়, যার ফলে রামমোহনকে গৃহত্যাগ করে চলে যেতে হয়।

গৃহত্যাগের পর রামমোহন দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ভারতের সীমানা পেরিয়ে সুদূর তিব্বতে উপনীত হন। কথিত আছে, সেখানে বৌদ্ধদের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার দেখে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। তাঁর সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে লামারা তাঁর প্রাণহানির চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা কৃতকার্য হতে পারেন না। কয়েকজন সহৃদয়া তিব্বতী মহিলার সাহায্যে তিনি তিব্বত থেকে পালিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে এসে বছরখানেক দেশ ভ্রমণের পর তিনি কাশীতে যান এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত কাশীতে থেকে তিনি হিন্দু-দর্শন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় তাঁর পরিবারের সংগে তাঁর যে বিচ্ছেদ হয়েছিল, তার অবসান হয়। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে, "আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে আমার পিতা আমাকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন, আমি পুনর্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম"।

পিতার আদেশে গৃহে ফিরে তিনি বিষয়কর্ম দেখা শোনায় মনোনিবেশ করেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি লেখেন, "ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদের আইন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞান লাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান্, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।" এই সময় রামমোহন ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। রামগড়, ভাগলপুর ইত্যাদি স্থানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি রংপুরের কালেক্টর ডিগ্বী সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। তার কিছুদিন পর তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান। মুর্শিদাবাদে থাকার সময় তিনি ফারসী ভাষায় "তুহফৎ উল মোয়াহ্‌হিদিন" (একেশ্বরবাদীদিগকে উপহার) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের সূচনা তিনি আরবী ভাষায় লেখেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সাধারণ মতৈক্য দেখা যায়। যখন সেই ঈশ্বরের উপর বিভিন্ন গুণের আরোপ করার প্রচেষ্টা

সুরু হয়, তখনই নানা মতভেদের সুরু হয়ে থাকে। তিনি বলেন, পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তগুলিতে সমতলভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করেছেন, তিনি দেখেছেন সকল দেশবাসীর মধ্যেই যিনি সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বনিয়ন্তা সেই এক মহান্ সত্তার প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে একটা সাধারণ মিল আছে। এই মহান্ সত্তার গুণ আরোপের সময়ে এবং বিভিন্ন ধর্মের বিধি-নিষেধ প্রবর্তনের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই সত্যের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক শাশ্বত সত্তার উপর বিশ্বাস করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সগুণ ঈশ্বর বা বিশেষ বিশেষ গুণের আধার বহু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অভ্যাস ও শিক্ষার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে।

বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক চর্চার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সারা বিশ্বে একেশ্বরবাদের যে বিশিষ্ট স্থান আছে তিনি তা দেখান। তিনি আরো বলেন যে, অন্ধ বিশ্বাস এবং কার্য কারণ সম্বন্ধে সত্যকার জিজ্ঞাসার অভাবেই আজ চারিদিকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বিরাজ করছে। স্বয়ং ঈশ্বরও যে তাঁর গঠিত বিশ্ববিধানের যা নিয়ম তা লঙ্ঘন করতে সমর্থ নন, এ কথা তিনি যুক্তি-তর্কের ভেতর দিয়ে প্রতিপন্ন করেন।

তাঁর "তুহফত-উল-মুহদ্দিন" পাঠ করলে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের প্রথমেই একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বধর্মের মূলে তিনি পৌঁছেছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রঙ্গপুরে বাসের সময় তিনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সংস্পর্শে আসেন। হরিহরানন্দ তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সে সময় রঙ্গপুর ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিল, তাই হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন। এই সময় রামমোহন জৈনদের সংগে পরিচিত হন এবং গভীর-ভাবে জৈনদের কল্পসূত্র ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

রঙ্গপুরে বাস করার সময় রামমোহন সমগ্র য়ুরোপ ও ইংলণ্ডে যে সব রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সংগঠন চলেছিল, যে সকল নব নব চিন্তাধারার উদ্ভব ও প্রকাশ চলেছিল তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিলেত থেকে ডিগ্রী সাহেবের যে সব সংবাদপত্রাদি আসত, তিনি সে সব বিশেষ মনোযোগ ও উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত পাঠ করতেন। এর ফলে তিনি ইংরেজি ভাষা এবং য়ুরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ডিগ্রী সাহেবের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি য়ুরোপের রাজনৈতিক মুক্তিবাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডিগ্রী সাহেব চিরদিনের মত ভারত ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান এবং রামমোহন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এতোদিন যে কাজ করছিলেন, তাতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ী-ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এতোদিনের প্রস্তুতির পর তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে রত হন—ভারতের গভীরতম উপলব্ধি যা বহু শতাব্দীর অন্ধ সংস্কার, কর্মকান্ড ও আচার-আচরণের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল, তার পুনরুদ্ধার করে তাকে নবযুগের বিশ্বচিন্তা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে জাতির জীবনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা।

রামমোহন শাস্ত্রের প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবলমাত্র শাস্ত্রের অন্ধ অনুসরণে মানুষ তার সর্বোচ্চ উপলব্ধিতে উপনীত হতে পারে না, শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে সাধারণ বিচার, বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহারও একান্ত প্রয়োজন। সত্যে উপনীত হবার জন্য তিনি মীমাংসা দর্শনের পথ অনুসরণ করেন। যে কোন বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণকে প্রথমেই স্বীকার করে না নিয়ে তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এবং পরে যুক্তি ও তর্কের ভিতর দিয়ে মীমাংসায় আসা বা সত্যে পৌঁছান এই হল মীমাংসা দর্শনের পথ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামমোহন বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত সার, কেনোপনিষদ্, কঠ ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ বাংলায় অনুবাদ করেন। বিশেষ কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ে তীক্ষ্ণ যুক্তি ও প্রখর প্রমাণ সহযোগে দৃঢ়ভাবে প্রকাশের রীতি রামমোহন প্রবর্তিত বাংলা গদ্যেই প্রথম প্রকাশ পায়। এ প্রতিষ্ঠা বাংলা গদ্যের আগে ছিল না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়—

"রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।" হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী ও বক্তৃতাদিতে তিনি বশিষ্ঠ ঋষির উক্তির উল্লেখ করেন, যাতে তিনি বলেছেন একটি শিশুও যদি যুক্তিপূর্ণ কিছু বলে তো তা গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কিছু বলেন তা খড়কুটোর মত বর্জন করা কর্তব্য। রামমোহন শাস্ত্র বাতিল করে দেন নি বরং যুক্তির পথে, বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রদর্শিত পথে শাস্ত্র বিচার করে গ্রহণ করেছেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল, সংস্কারপ্রয়াসী কয়েকজন রামমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, যথা, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইত্যাদি। এই সভায় বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার

হত। এ ছাড়া কুলীন প্রথা, নারী বিক্রয়, জাতিভেদ ইত্যাদি সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে এই সভাতেই প্রথম আন্দোলন সুরু হয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা য়ুনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও অর্থ সাহায্যকারী ছিলেন রামমোহন রায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের এবং দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতার মধ্যেও তিনি মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক্ যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তা বুঝেছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁর পার্থিব এবং অর্থনৈতিক দিক্‌কে অস্বীকার করতে পারেন নি। সামুদায়িক ভাবে মানুষের উন্নতি চেয়েছিলেন।

এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামমোহন বলেন, যা কিছু শিক্ষার গুণ বিস্তারে, অথবা অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, গোড়ামী ও উন্মত্ততার বিনাশে, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবোধ বিকাশের সহায়ক, যা কিছু বিশ্ব প্রেম ও কল্যাণ কর্মে সহায়ক সে সবই এই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

এই সময় বাংলাদেশে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এঁরা অনেকেই সুপণ্ডিত ও ধার্মিক ছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং বিস্তার ছিল এদের কাজের প্রধান অঙ্গ এবং তার জন্য হিন্দু ধর্মের চেয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার জন্য এঁরা নির্দয়-ভাবে এবং অনেক সময়ই ভুলভাবে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে বক্তৃতা প্রবন্ধ রচনাদি প্রস্তুত করতেন। রামমোহন তাঁর বাংলা 'সেবধি' ও ইংরেজী 'ব্রাহ্মনিক্যল ম্যাগাজিন' নামক দুই পত্রিকাতে হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদ ও বেদান্তের দৃষ্টান্ত দিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের অন্যায় আক্রমণের প্রতিরোধ আরম্ভ করেন। তিনি হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল 'বাইবেল' বিশেষ যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। যীশুখ্রীষ্টের মূল শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের ত্রীশ্বরবাদ খ্রীষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর রচিত 'Precepts of Jesus—a guide to peace and happiness' পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলেন, মানুষের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক হিসাবে খ্রীষ্টের উপদেশ "অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর, যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর অন্যের কাছে—" এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোন ধর্মগ্রন্থে পান নি।

Precepts of Jesus এ যীশুখ্রীষ্টের জীবনের সব অলৌকিক বৃত্তান্ত-গুলিকে রামমোহন সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যেমন তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অন্য দিকে বিধর্মী জ্ঞানে তাঁর প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের রোষ তেমনই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। এই পুস্তককে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টান ধর্ম-

যাজকদের সঙ্গে তাঁর ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু হয় এবং বহু বাদ প্রতিবাদ উভয় পক্ষ থেকে ছাপা হয়। অবশেষে এই বিরোধের পরিসমাপ্তিতে রাম-মোহন লেখেন ঈশ্বর ধর্মকে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ও বিদ্বেষ ঘুচিয়ে শান্তি ও মিলনের উপায় স্বরূপ করে তুলুন। এইখানেই তাঁর প্রবর্তিত বিশ্বধর্মের সূচনা দেখা যায়।

বিশ্বধর্ম স্থাপনার প্রয়াসী রামমোহনই সর্বপ্রথম হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান এই চারটি প্রধান ধর্মমতের তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং এই চারটি মহান্ ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করেন। মধ্যযুগের সাধকবৃন্দ, যথা নানক, কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সাধনায় ভেদবুদ্ধির অহঙ্কার থেকে মুক্তিলাভের কথা বলেছেন। এই ঐক্যের পথ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীকে অঙ্গীভূত করে নেবার পথই ভারতের পথ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামমোহন বুঝেছিলেন, এ যুগের আহ্বান সেই সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান কারও স্থান-সঙ্কীর্ণতা নেই। তাঁর হৃদয় ভারতেরই হৃদয়। তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।"

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ য়ুনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যখন ভেঙে এলো, তখন রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন যেখানে নিরাকার, অদ্বিতীয় একেশ্বর পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। ২০শে আগষ্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৪৮নং চিৎপুর রোডে তাঁরা ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী ভাড়া করে ব্রহ্মসভা স্থাপনা করলেন। রামমোহনের প্রথম শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই সভার প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। দু'বছর পর ২৩শে জানুয়ারী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কমল বসুর বাড়ীর পাশেই ব্রাহ্ম সভার নিজস্ব উপাসনা গৃহ প্রস্তুত হল এবং তার নাম দেওয়া হল ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ। নব প্রতিষ্ঠিত উপাসনা মন্দিরের ট্রাষ্ট ডিড পত্রের সার মর্ম এই যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে মিলিত হয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করতে পারবে। এই ব্রহ্মসমাজই পরবর্তী যুগে ব্রহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয়।

তৎকালীন হিন্দু সমাজে কোন রকম সংস্কার বিশেষতঃ ধর্ম সংস্কার খুবই দুরূহ কাজ ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু সি. এফ. এ্যানড্রুজ-এর উক্তি রাজা রামমোহনের সংস্কারক মূর্তিটি পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন, "Ram Mohan Roy was the true pioneer

of social reform. He was essentially a man of faith, a man of religion, whose life was established in God. From this basis his social reform proceeded. Social reform was not in any way divorced from true religion." সাকার পূজা, প্রচলিত ধর্মাচরণ ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করায় হিন্দু সমাজের কাছে তাঁকে নির্যাতন ও প্রতিরোধ সহ্য করতে হয়েছিল। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্ম-সভার অনুরূপ ধর্মসভা গড়ে ওঠে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, "সে সময় ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন, কেহ বলিতেন ব্রাহ্ম সমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি গম্ভীর-ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন—কোন সহযোগী সঙ্গে আসুক আর নাই আসুক! শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন, এই একটি তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।" হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করুক বা না করুক রামমোহন নিজেকে কখনও অহিন্দু বলেন নি। তাঁর আত্মচরিতে তিনি লেখেন, "আমি কখনও হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আক্রমণের বিষয় ছিল।"

সমাজসংস্কারক হিসাবে রামমোহন প্রচলিত পাঁচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, যথা জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ এবং সতীদাহ। এই পাঁচটির প্রথম দুটির সংস্কার তিনি ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে করতে চেষ্টা করেন।

নারী জাতির প্রতি রামমোহনের অন্তরে একটি গভীর বেদনাবোধ ও সহানুভূতি ছিল। সে সময়কার হিন্দু সমাজে নারীর অসহায় ও অবহেলিত অবস্থা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনিই প্রথম যিনি তাদের কল্যাণ মানসে অগ্রসর হন। যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এবং বিধবা নারীর বলপূর্বক সহমরণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের লেখায় নারীজাতি সম্বন্ধে নানারূপ অমূলক তির্যক্ দৃষ্টি যে, নারীজাতি অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিশ্বাসের অযোগ্য, ধর্মজ্ঞানশূন্যা, রামমোহনকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও বির্তকের দ্বিতীয় সংবাদ" পুস্তিকাতে তিনি নারী-বিদ্বেষীদের প্রতিটি যুক্তি অথবা কুযুক্তি অত্যন্ত সুচারু অথচ নির্মমভাবে খণ্ডন করেন।

"প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব গ্রহণ করিতে না পারে, তখন

তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছে, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

তৃতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্রে দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষ স্ত্রী-লোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণ্য করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে, আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।"

সে সময় সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুসারে বিধবা পত্নীকে স্বামীর চিতায় দাহ করার যে নৃশংস রীতি ছিল তাকে তিনি অশ্রদ্ধেয় ও ধর্মের অবমাননাস্বরূপ জ্ঞান করেন এবং এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটি রাজবিধি প্রণীত হয়, তাতে এই আদেশ প্রচার করা হয় যে, সহমরণে ইচ্ছুক বিধবা পত্নীকে প্রথমে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজ কর্মচারীর কাছে সহমরণের জন্য অনুমতিপত্র নিতে হবে। এই বিধিকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। রক্ষণশীল দল এই বিধি রহিত করবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন, অন্যদিকে রামমোহন এই কুপ্রথা বন্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়, তা দেখাবার জন্য তিনি

লেখনী ধারণ করেন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দ্রিকা" এই দুই পত্রিকায় সহমরণের বিপক্ষে এবং সপক্ষে প্রবন্ধাদি চলতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বাধা সত্ত্বেও রামমোহনের একান্ত চেষ্টায় প্রণোদিত হয়ে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড বেণ্টিং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২৯-এর রেগুলেশন অষ্টাদশ দ্বারা সহমরণ প্রথা বন্ধ করেন।

নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম নেতা ছিলেন রামমোহন। সহমরণ প্রথা নিবারণের জন্য দ্বিতীয় যে সভা হয়, তাতে তিনিই সর্বপ্রথম জোরের সংগে বলেন যে, পুরুষের চেয়ে নারী বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি কোনো অংশেই হীন নয়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে আজও ভারতীয় নারীদের মধ্যে লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, ভানুমতীর ন্যায় ক্ষণজন্মা নারীর অভ্যুদয় হতে পারে। তিনি বলেন, পুণ্যবতী, সাহসী, সতী নারীদের বহুবিবাহ রত পুরুষের নির্যাতনের মাঝে দুঃখভোগ করান অনুচিত। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি তাঁর নিজের চরমপত্রে বা উইলে লিখে যান যে, যদি তাঁর কোন পুত্র একই সংগে একের অধিক পত্নীর স্বামী হয়, তাহলে সে তাঁর সম্পত্তির অংশ পাবে না। বহুবিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি সরকারের কাছেও আবেদন করেছিলেন। এ ছাড়া হিন্দু নারীর দায়াধিকার অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিতে কন্যার এবং স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা সম্বন্ধেও তিনি তাঁর অনেকখানি চিন্তা ও যত্ন নিয়োগ করেছিলেন। কন্যাপণ ও কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করে তিনি এ বিষয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করেছিলেন। এমনও বলা হয় যে, রামমোহন পুরুষের দ্বিতীয় বার বিবাহের আগে কি কারণে বিবাহ প্রয়োজন এ বিষয়ে জেলাশাসকের কাছ থেকে ছাড়পত্র নেওয়া সম্পর্কে একটি আইন প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। হিন্দু বিধবাদের জন্য একটি অর্থভাণ্ডার খুলবার পরিকল্পনা করেছিলেন রামমোহন। অত্যাচারিত উৎপীড়িত মানুষের প্রতি রামমোহনের দরদ তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৃষিজীবীদের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে রামমোহনই প্রথম তথ্যভিত্তিক তদন্ত করেন। রামমোহন সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কাজে ও লেখার মধ্য দিয়ে তাই প্রকাশ পায়। সমাজকে রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচলনের পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের ১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে

তিনি ভারতীয় যুবকদের মধ্যে অংক, বিজ্ঞান, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনুরোধ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে নির্দিষ্ট অর্থ কেবলমাত্র প্রাচ্য শিক্ষায় ব্যয় হতে চলেছে দেখে তিনি প্রচলিত সংস্কৃত ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষায় এই অর্থের অপব্যয় না করে যে শিক্ষার দ্বারা য়ুরোপ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে সেই শিক্ষা ভারতীয়দের মধ্যে বিস্তারে যাতে এই অর্থ ব্যয় করা যায় তার জন্য বিশেষ ভাবে আবেদন জানান। এই সময়কার অবস্থা এবং রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তখন দেশে একটা দল ইংরেজী শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছ বিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব এই ছিল তাদের ভয়। এ কথা কেউ বলতে পারেন না যে, রামমোহন পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাদ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে জ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন, দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন।" ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁর বেদান্ত কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচায়ক। এ ছাড়া তিনি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটির একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সরকার, রামমোহন প্রদর্শিত শিক্ষা নীতি গ্রহণ করেন। এই শিক্ষার মাধ্যমে দেশে ক্রমশঃ রাজনৈতিক চেতনা জেগে ওঠে।

দেশপ্রেমী রামমোহন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বললে খুব ভুল হবে না। বাংলায় পুস্তকাদি ছাড়াও তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, যাতে ভারতাগত ইংরাজ কর্মচারিবৃন্দ সহজে বাংলা ভাষা শিখতে পারেন এবং বাংলার শাসন ব্যবস্থায় যাতে ফারসী বা উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও রামমোহন কোনদিনই বিশ্বাস করতেন না যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সব কিছুতেই বিদেশীর অনুকরণ করে। মনে হয়, রামমোহনের স্বদেশ প্রীতির প্রভাব পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করেছিলেন, তার গুরুত্ব কম নয়। তাঁর এই প্রচেষ্টা সারা দেশে এক নতুন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাডাম্‌স্‌ রেগুলেশন ৩ দ্বারা সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এই আইন অনুসারে সংবাদপত্রগুলির সরকারের কাছ থেকে ছাড়পত্র বা লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। এই

ছাড়পত্র গ্রহণের যে সকল সর্ত ছিল তা আত্মসম্মানহানিকর। রামমোহন এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর 'মিরাট উল-আকবর' নামক ফারসী সংবাদপত্র প্রকাশ করা বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবী করে তিনি ইংলণ্ডের রাজাকে এবং সুপ্রীম কোর্টে পত্র লেখেন, তিনি জানান যে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে জনমত এবং জনতার ভাবাবেগ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা রাজ সরকারের দেশ শাসনের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না অথবা তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। দেশবাসীর সংহত অভাব-অভিযোগের অবরুদ্ধ বেগ হয়তো দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়ে তুলতে পারে। তাঁর এই চেষ্টার ফলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মেট কাফস্ অ্যাক্টের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবাদপত্র পরবর্তী রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের জুরী আইন অনুসারে হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে জুরীতে থেকে যে কোনও খৃীষ্টান, এমন কি ধর্মান্তরিত ভারতীয় খৃীষ্টানেরও বিচারের অধিকার ছিল না। গ্র্যান্ড জুরীতে কোন হিন্দু বা মুসলমানের স্থান ছিল না। রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভেদের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাম-মোহন ভারতীয় নাগরিকদের সাধারণ ও রাজনৈতিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৯শে আগষ্ট, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি খাজনার অত্যধিক চাপে প্রপীড়িত রায়তদের পক্ষ গ্রহণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, সরকারকে দেয় জমিদারদের রাজস্বের হার কমান হক, যাতে সেই অনুপাতে দরিদ্র রায়তদেরও করের হার কমান সম্ভব হয়। এর দরুন সরকারের যে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে তার পূরণের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, উচ্চ বেতনধারী ইংরাজ কালেক্টরের পরিবর্তে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা বেতনে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগ করা হোক। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, বিলাস দ্রব্য বিক্রয়ের উপর যদি কর ধার্য করা হয়, তাহলে তাতেও আর্থিক ক্ষতি পূরণের সহায়ক হবে। রামমোহনের উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। ১৮৩৩ থেকে কালেক্টরের পদে এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার রীতি প্রচলিত হয়। রামমোহন কিন্তু এখানেই বিরত হন নি, রেভিনিউ এবং অন্যান্য বিভাগেও যাতে উচ্চ পদগুলিতে শিক্ষিত সদ্বংশীয় ভারতীয়দের সুযোগ দেওয়া হয়, তিনি তার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকারকে তিনি জানান যে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে অন্ধ হয়ে তাঁরা যেন মাত্র ২৪-২৫ বৎসরের ইংরাজ সিভিলিয়ানদের এ দেশে শাসনকর্তারূপে না পাঠান।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ধনসম্পদ কিভাবে শোষিত হচ্ছে তার প্রতি

রামমোহনই সর্বপ্রথম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই সময় ইংলণ্ডে স্বাধীন ব্যবসায়ী ও একচেটিয়া কারবারীদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব চলেছিল, রামমোহন এই দ্বন্দ্বে স্বাধীন ব্যবসায়ীদের পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া নুনের কারবারের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৭ই আগষ্ট, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জে ক্রফর্ডকে লিখিত রামমোহনের পত্রে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে আগত ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদা হানিকর যে কোনরূপ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে প্রতিরোধ করবার মত মনোভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠছে।

জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে ভারতীয় জনতাকে জাতীয়তার সূত্রে এক করে তোলার প্রয়াসী, ঐক্যকামী রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের বিভেদকারী চেষ্টার ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, খ্রীষ্টানদের কাছে ভারতের কোন ঋণের দায় নেই বরঞ্চ বিশ্বের কাছে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম প্রাচ্যেরই অবদান।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের ১৫ তারিখ রামমোহন বিলেত যাত্রা করেন। এই যাত্রার মুখ্যতঃ তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের পক্ষ থেকে ইংলণ্ডের রাজার কাছে দৌত্যকার্য, দ্বিতীয়তঃ সেই সময় ধর্মসভা সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আপিল করে, তাই হাউস অফ কমন্স্-এর কাছে এই আইনের স্বপক্ষে আবেদন করা, তৃতীয়তঃ সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ শেষ হয়ে এসেছিল। চতুর্থবারের মত বিশ বৎসরের জন্য কোম্পানীর নতুন সনদ লাভ ও শাসন সংস্কারের বিষয়ে হাউস অফ কমন্স্-এ আলোচিত হবার সময় সেই অধিবেশনে উপস্থিত থাকা।

বিলেত যাত্রার বহু পূর্বেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। লিভারপুল হয়ে লণ্ডনে পৌঁছে রামমোহন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিলেতে প্রচুর সম্মান লাভ করেন, যা তাঁর নিজের দেশবাসীর কাছে তিনি পান নি। সেই সময় ইংলণ্ডে রিফর্ম বিল পাস হওয়া নিয়ে বিশেষ আন্দোলন চলছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই বিলটি পাস হওয়ায় রামমোহন বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন।

রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফ্রান্সেও তাঁর নাম অবিদিত ছিল না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে তিনি ফরাসী দেশে যান এবং ১৪ই অক্টোবর প্যারিসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে তাঁর একটি জীবন আলেখ্য

প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর জীবনের ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকে আলোকসম্পাত করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের সূত্রে বলা যায় যে, রাজা রামমোহন নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ভারতে নয়, বস্তুতঃ সমগ্র পৃথিবীর প্রথমতম সর্বজনীন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁর সমর্থন সমভাবে ছিল ইতালীর কার্বোনারীদের প্রতি, আয়ার ল্যাণ্ডের আইরিশ, যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের প্রতি এবং আরও অগণিত মানুষ যারা কোথাও না কোথাও স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত আছেন, তাদের সকলের প্রতি। অত্যধিক চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে রামমোহনের স্বাস্থ্য ভেঙে এসেছিল। তার উপর যে ব্যাঙ্কে তাঁর সঞ্চয়াদি ছিল, হঠাৎ সেই ব্যাঙ্কটি ফেল হওয়ায় তাঁকে আর্থিক কষ্টেও পড়তে হয়। বন্ধুদের বিশেষ আগ্রহে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লন্ডন ত্যাগ করে ব্রিস্টলে যান। সেখানে তিনি তাঁর পাদ্রী বন্ধু ডাঃ কার্পেণ্টারের আতিথ্য স্বীকার করেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ারের ভগিনী তাঁর সেবাশুশ্রূষার ভার নেন। বড় বড় চিকিৎসকও দেখান হয়, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পবিত্র ওঁকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোন নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তং শিবং দ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নব্য বাংলার রচয়িতাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের পরই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম করতে পারি। বিদ্যাসাগর চরিত বর্ণনার সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্য সুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্র-মাহাত্ম্য তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে"।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। মেদিনীপুরের বনমালীপুরে তাঁর পৈত্রিক বাসভবন ছিল। যে ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের গুণগৌরব ও তেজস্বিতার জন্য প্রদেশে খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উত্ত্যক্ত হয়ে কিছুদিনের জন্য গৃহত্যাগ করে দেশান্তরী হয়েছিলেন। বহুকাল পরে দেশে ফিরে তিনি দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবী শ্বশুরবাড়ীতে অনাদৃত হয়ে বীরসিংহ গ্রামে তাঁর পিতা উমাপতি তর্ক সিদ্ধান্তের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। পিত্রালয়েও ভাই এবং ভাইবৌদের কাছে নানাভাবে লাঞ্ছিত হওয়ায় বৃদ্ধ পিতার সাহায্যে পিতৃগৃহের কাছেই একটি ছোট কুটিরে বাস করতে আরম্ভ করেন এবং চরকায় সুতো কেটে সামান্য যা উপার্জন করেন তাই দিয়েই পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ করে সংসার প্রতিপালন করেন।

রামজয় তর্কভূষণ তাঁর নিজের ভাইদের অন্যায় আচরণের কথা জেনে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে আর নিজের গ্রামে ফিরলেন না, বীরসিংহের সেই কুটিরেই তিনি রয়ে গেলেন। পিতামহের চরিত্র বর্ণনায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন :—

তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকার অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে সকল বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।"

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস ঘোর দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করে নিজের শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজের পায়ে দাঁড়ান। চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়সে তিনি উপার্জনের চেষ্টায় কলকাতায় যান। সেখানে তাঁর আত্মীয় জগমোহন তর্কালঙ্কারের গৃহে ওঠেন এবং ইংরেজি শিখলে সদাগরী আপিসে কাজ পাওয়া সহজ হবে মনে করে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এক শিপ-সরকারের বাড়ি ইংরেজি শিখতে যেতেন। সেখান থেকে ফিরতে প্রায়ই বেশী রাত হয়ে যেত। তিনি যতক্ষণে ফিরতেন ততক্ষণে আশ্রয়দাতার গৃহে খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রায় রাতেই তিনি উপবাসে কাটাতেন। এইভাবে ইংরেজি শেখার পরে তিনি উপার্জন আরম্ভ করেন, প্রথমে মাসে ২ টাকা বেতনে আরম্ভ করে যখন মাসে আট টাকা উপার্জন আরম্ভ করেন, তখন রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সংগে ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এদের প্রথম সন্তান।

ভগবতী দেবী একজন অসামান্যা নারী ছিলেন। সে যুগের মহিলাদের মধ্যে তাঁর মত উদার দৃষ্টিভঙ্গী সচরাচর দেখা যেত না। প্রয়োজন হলে তিনি দেশাচার লোকাচারের ঊর্ধ্বে গিয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে পরোপকারের জন্য এগিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না। বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে ভগবতী দেবী সম্বন্ধে লিখেছেন

একবার বিদ্যাসাগর তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বছরের মধ্যে একদিন পুজো করে ছয় সাতশ' টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, না গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদের ঐ টাকা দিয়ে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা ভাল। ভগবতী দেবী উত্তর দেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে, পুজা করিবার আবশ্যক নাই"। সংস্কারাচ্ছন্ন সেই যুগে এমন সহজ করে কথাটি বলা এমন কি চিন্তা করাও খুবই দুরূহ ছিল।

আরেকটি ঘটনা, সিবিলিয়ন মিস্টার হ্যারিসন একবার মেদিনীপুরে এসেছেন জেনে ভগবতী দেবী নিজের নামে পত্র লিখে তাঁকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :—

"জননীদেবী, সাহেবের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন, যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক, সাহেবের ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।......সাহেব হিন্দুর মত জননী দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইল। জননী দেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্,

কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয়, কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দু-ধর্মাবলম্বী, কি অন্য ধর্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।"

আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন :—

"১২৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য, অগ্রজমহাশয় বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, এ কারণে জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।"

একবার অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের বীরসিংহ গ্রামের বাসস্থান পুড়ে গেলে বিদ্যাসাগর তাঁর মাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান, কিন্তু ভগবতী দেবী বলেন, 'যে সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে'। সারা গ্রামের তিনি ছিলেন স্নেহময়ী জননী। তাঁর অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলি, দয়া, উদারতা প্রভৃতি তিনি তাঁর সন্তান বিদ্যাসাগরের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা সর্বজনবিদিত। সারা জীবন তিনি মাতৃ-আজ্ঞাকে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়ে এসেছেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাসাগর পার্থিব সম্পদের মধ্যে বীরসিংহ গ্রামের একখানি কুটির মাত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু অপার্থিব দিক থেকে তিনি তাঁর পিতৃপিতামহ এবং মাতার কাছ থেকে সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, চরিত্রের দৃঢ়তা, অসীম সাহস, ধৈর্য, উদারতা এবং গভীর মানবতা বোধ প্রভৃতি অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

সাংসারিক অভাব, অনটন বিদ্যাসাগরের প্রতিভাকে খর্ব করতে পারেনি বরং এই সবের সঙ্গে সংগ্রাম করে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহাকে প্রখরতর করেছিলেন। শৈশবে তিনি গ্রামের পাঠশালাতে বিদ্যারম্ভ করেন। সেই সময় থেকেই লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং মেধার পরিচয় পেয়ে ঠাকুরদাস তাঁকে ভাল শিক্ষার সুবিধা দেবার ইচ্ছায় কলকাতায় নিয়ে আসেন। কলকাতায় ঠাকুর দাসের মনিব বড়বাজারের ভগবৎ চরণ সিংহের গৃহে তাঁরা বাস করতেন এবং বিশেষ অসাচ্ছল্য ও কষ্টের মধ্যে তাঁদের সেই সময় কেটেছে। বাসায় তাঁরা চারজন বাস করতেন। বিদ্যাসাগরকে বাজার করা, উনুন ধরান, বাটনা বাটা ইত্যাদি সব আয়োজন করে দু'বেলা রান্না করতে হত। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো পরিষ্কার করে বাসন মাজা ইত্যাদি সব কাজ করতেন এবং এই

সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও বিদ্যালয়ে যাবার সময় পথ চলতে চলতে তিনি নিজের পাঠাভ্যাস করতেন। কখনও রাত দশটায় শুতে গিয়ে আবার মধ্যরাত থেকে সারা রাত জেগে পড়াশুনা করতেন।

কলকাতায় এসে কয়েক মাস পাঠশালাতে অধ্যয়ন করবার পর ১লা জুন, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর একাগ্রতা ও মেধার পরিচয় দেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন। সারা ছাত্রজীবনই তিনি বৃত্তির সাহায্যে পড়াশুনা করেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয়ে সসম্মানে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সে সময় মফঃস্বল সহরগুলিতে ইংরেজ জজদের আদালতে একজন করে জজ পণ্ডিত থাকতেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা দেওয়া তাঁদের কাজ ছিল। সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্ররা সাধারণতঃ এই কাজটি পেতেন। কর্মপ্রার্থীদের সাধারণতঃ ল-কমিটি নামে একটি কমিটির কাছে পরীক্ষা দিতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র সতের বৎসর বয়সে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিপুরাতে কাজ পান কিন্তু ঠাকুরদাস তাঁকে অতদূরে যেতে দিলেন না।

কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হবার পর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী রসময় দত্তের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি সে পদ ত্যাগ করে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও ট্রেজারারের পদে ফিরে আসেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন এবং পরের বছর ২২শে জানুয়ারী প্রিন্সিপালের পদে উন্নীত হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারী ডঃ মাউট সংস্কৃত সাহিত্যের এই নতুন অধ্যাপকটিকে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর একটি সুসংস্কৃত পরিকল্পনা দেবার জন্য অনুরোধ করায় রসময় দত্ত নিজেকে অপমানিত মনে করেন এবং পদত্যাগ করেন। তাঁর চলে যাবার পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীর পদ দুটি তুলে দেওয়া হয়।

পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী সাহায্যে যে বিদ্যালয়গুলি চলে তার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তাঁর সেই রিপোর্টটির গুণে এবং সার চার্লস উডের ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন ডেসপ্যাচের ভিত্তিতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার স্পেশাল ইন্স্পেক্টর অফ স্কুলস্-এর পদটি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে অবশ্য

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের কাজটিও তাঁকে করতে হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি দুটি পদই ত্যাগ করেন, তার প্রথম কারণ দক্ষিণ বাংলার ইন্স্পেক্টরের পদটি খালি থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তাঁকে সে পদটি না দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ তদানীন্তন ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্স্ট্রাকশনস্ মিঃ ডাব্লিউ. সি. ইয়ংয়ের সঙ্গে মতভেদ।

সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর সংস্কৃতপ্রেস এবং স্বরচিত পুস্তকের বিক্রয় থেকে যে আয় হত তাই ছিল তাঁর একমাত্র জীবিকার উপায়। হিন্দু আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার থেকে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক পড়ত তাঁর মত দেবার জন্য। সরকারী চাকরী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু তাতে তাঁর কর্মজীবনের অবসান হয়নি এবং তিনি আরো আগ্রহের সঙ্গে দেশ এবং জনতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসীম সাহস ও দুর্লভ নির্লিপ্ততার সঙ্গে গভীর আত্মসম্মান বোধ। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণ অশিষ্টাচরণের তিনি যেভাবে প্রত্যুত্তর দিতেন, তাতে তাঁর স্বদেশবাসী এক নতুন মর্যাদাবোধের চেতনা ও প্রেরণা লাভ করেছিল। একবার বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্টার কার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে গিয়েছিলেন। কার সাহেব তখন তাঁর নিজের কক্ষে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে বসেছিলেন এবং সেইভাবে বসে থেকেই বিদ্যাসাগরকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই যখন কার সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে দেখা করতে যান, তখন বিদ্যাসাগরও অনুরূপভাবে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকেন এবং সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ করেন। তাঁর এই অশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে কার সাহেব অভিযোগ করায় ডঃ মাউট যখন বিদ্যাসাগরকে জবাব দিহি করতে বলেন, তখন তার প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন, "মিঃ কার আমার যে ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন, তা মাত্র ক'দিন আগেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যখন গিয়েছিলাম, তখন তাঁর কাছেই শিখেছি। একজন আলোক-প্রাপ্ত, সুসভ্য য়ুরোপীয়র কাছ থেকে মার্জিত আচরণ সম্বন্ধে আমার ধারণা হওয়ায় তিনি আমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন আমিও তাঁর সঙ্গে ঠিক অনুরূপভাবেই শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করেছি। অতএব অন্ততঃ এই ব্যাপারে আমার উপর কোন দোষারোপ চলে বলে আমি মনে করি না"। বিদ্যাসাগরের এই পুরুষোচিত মর্যাদাবোধ ডঃ মাউট-এর মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় মিঃ কার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটি বন্ধুভাবে মিটিয়ে ফেলেন।

তাঁর এই মর্যাদাবোধই তাঁকে কর্তৃত্বাভিমানে মত্ত ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকশনস্‌ মিঃ ইয়ংয়ের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনায় বাধাদান ও অন্যান্য অনুচিত হস্তক্ষেপ সহ্য করতে দেয়নি। এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠায় বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর ৫০০ টাকা বেতনের চাকরী ও ভবিষ্যৎ পেনসনের মায়া ত্যাগ করে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তাঁর এই পদত্যাগে হতভম্ব বন্ধুবান্ধবকে তিনি বলেন, "আত্মসম্মানের চেয়ে মূল্যবান্‌ তো অন্য কিছু নয়"।

তাঁর মর্যাদাবোধের মতই গভীর তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পরনে ধুতি, চাদর ও তালতলার চটি তাঁর স্বাদেশিকতার পরিচায়ক। কি য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে, কি দরবারে, সর্বত্র এই ছিল তাঁর পরিধেয়। কোন আদেশ বা প্রচলিত রীতি তার এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে নি। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের দরবারে যখন রয়েল প্রোক্‌লামেশন বা রাজ-আজ্ঞা বাংলায় পাঠ করবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন, তখন দরবার গৃহে প্রবেশের পথে দারোয়ান তাঁকে চটি পায়ে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, এমন সময় সৌভাগ্য-ক্রমে সার সেসিল্‌ বীডন সেখানে উপস্থিত হওয়ায় কোন অনর্থ ঘটতে পারেনি। আর একবার ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে যান। সে সময় এশিয়াটিক সোসাইটি এবং যাদুঘর একই গৃহে অবস্থিত ছিল। লাইব্রেরীর দ্বারে দ্বারওয়ান বিলিতী জুতো পায় তাঁর বন্ধু দুজনকে প্রবেশ করতে দিয়েছিল কিন্তু চটিজুতো পরিহিত বিদ্যাসাগরকে প্রবেশ করতে দেয়নি, উপরন্তু তাঁকে চটি খুলে সেটি হাতে করে নিয়ে যেতে বলে। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ সেখান্‌ থেকে ফিরে চলে যান এবং কঠোর ভাষায় শুধুমাত্র পরিধেয় বা জুতোর তারতম্য হিসেবে পাঠাগারে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লেখেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই-এর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ইংলিশ-ম্যান' পত্রিকাতে এই ধরনের জনপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ সম্পর্কে এইরূপ আত্মগ্লানিকর নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং এইসব নিয়ম বাতিল করে দেবার জন্য আবেদন বেরোয়।

দেশব্যাপী বিরাজমান অজ্ঞতার তমিস্রাকে দূর করার প্রধান উপায় শিক্ষা বিস্তার, এই বিশ্বাস নিয়ে ছাত্রজীবনের অবসানে বিদ্যাসাগর শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই কাজেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মিঃ জি. টি. মার্শালের সঙ্গে সহযোগিতা করে বাংলা দেশের হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের ভার তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নেন।

স্পেশাল ইন্স্‌পেক্টর থাকা কালীন তিনি বাংলাদেশের নানা মফঃস্বলে কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় বা মডেল স্কুল স্থাপন করিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের এক অংশে সরকার এই স্কুলগুলির শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্য একটি নর্মাল স্কুল খুলেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই নর্মাল স্কুলের সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে, রামকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্থান নিয়েছিলেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজে বিদ্যাসাগর যখনই যেখানে যেতেন সেখানে তিনি স্থানীয় ধনী জমিদারদের নিজ নিজ এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করায় প্রবৃত্ত করতেন এবং নিজে তাঁদের সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর নিজের গ্রামে তিনি দুটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন, একটি বালকদের ও অপরটি বালিকাদের জন্য। এ ছাড়া দরিদ্র কৃষকদের সন্তানরা যাতে পড়াশুনার সুযোগ পায় সেজন্য তিনি একটি নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপনা করেছিলেন। এই সব ক'টি প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার তিনি নিজে বহন করতেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্প্রসারণের নিঃস্বার্থ চেষ্টার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে শংকর ঘোষ লেনে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ট্রেনিং স্কুল। সরকারী বিদ্যায়তনগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্ন বেতনে এইখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু যুবকদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত। কম বেতনের যে মিশনারী বিদ্যায়তনগুলি ছিল সেগুলি প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল, সেগুলির আওতা থেকে যুবকদের দূরে রাখাও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানটির দেখাশোনার ভার নেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ট্রেনিং স্কুলের নাম পরিবর্তন করে হিন্দু মেট্রোপলিটন ইন্স্‌টিটিউশান রাখা হয় এবং বিদ্যাসাগরের একান্ত নিষ্ঠা ও চেষ্টায় এটি একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ থেকে এখানে অনার্স এবং আইন পড়াবার ব্যবস্থাও করা হয়। আন্তরিক যত্ন ও আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়ে শুধু মাত্র ভারতীয় প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার কতখানি উন্নতিসাধন করা সম্ভব তা বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকারিবৃন্দ—যথা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি—ইংরেজ শিক্ষাব্রতীদের দেখাতে পেরেছিলেন।

প্রধান পণ্ডিতরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করবার পরই বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন দেশের অগ্রগতির জন্য ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের কতখানি প্রয়োজন। তিনি নিজে রাজনারায়ণ বসু এবং দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর অসামান্য মেধা ও অধ্যবসায়ের গুণে অতি অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজি ভাষা ভালভাবে

আয়ত্ত করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। বেনারস সংস্কৃত কলেজের য়ুরোপীয় প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগরের এই ব্যবস্থার গভীর সমালোচনা করেন, কিন্তু কোন নিন্দা বা সমালোচনা তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য থেকে কোনদিন বিচলিত করতে পারে নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় হলেই তবে ছাত্ররা ভাল করে বাংলা ভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে।

উদারচেতা বিদ্যাসাগর যেমন একদিকে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি জাতি বর্ণের ভিত্তিতে এই কলেজের ছাত্র নির্বাচনের প্রচলিত রীতিকে স্বীকার করতে পারেন নি। সে সময় কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণেরই প্রবেশাধিকার ছিল। কাউন্সিল অফ এডুকেশনের কাছে তাঁর ২০শে মার্চ, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের ফলে কায়স্থ এবং শূদ্রবর্ণের ছাত্ররা এই কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করে। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের তীব্র আপত্তিকে তিনি এই বলে খণ্ডন করেন যে, অব্রাহ্মণ য়ুরোপীয়দের অর্থের বিনিময়ে তো তাঁরা দেবভাষা শিক্ষা দিতে কোন আপত্তি করেন না, তবে এক্ষেত্রেই বা সে আপত্তি কেন?

মাতৃভাষার প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর অনুরাগ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বাংলা রচনার মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্য ও গম্ভীরতা দেখা যায়, যার অভিনবত্ব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তিনি বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। বাংলা গদ্যে তিনি কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতগুলো বক্তব্য পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃংখল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে"। ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার মধ্যে যে প্রচুর সম্ভাবনা নিহিত আছে, নব্য বাংলার কাছে তিনিই সেটা প্রথম তুলে ধরেছিলেন। তাঁর রচিত "সীতার বনবাস", "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "শকুন্তলা" ভাষার গাম্ভীর্য ও রচনাভংগীর দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে আদর্শের স্থান অধিকার করেছিল। তাঁর "বর্ণপরিচয়", "বোধোদয়" ও "কথামালা" শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে আজও অমূল্য হয়ে আছে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, সংস্কৃত কলেজ শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষারই কেন্দ্র নয়, উপরন্তু উচ্চাংগের

বাংলার জন্মস্থান। তত্ত্ববোধিনী সভার পেপার কমিটির সভ্য হিসাবেও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষার সেবা করে গেছেন। এই কমিটির কাজ ছিল প্রকাশোপযোগী পুস্তক প্রবন্ধাদি নির্বাচন করা।

বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পৌরুষের অন্তঃস্থলে নারী জাতির প্রতি একটি স্নেহমিশ্রিত ভক্তির ভাব ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে দুইটি নারীর প্রভাব অতি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এই দু'জনের একজন তাঁর জননী ভগবতী দেবী অন্য জন ভগবৎ সিংহের কন্যা রাইমণি। এই মহীয়সী নারী সম্বন্ধে তিনি তাঁর জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেনঃ—

"রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই"।

বিদ্যাসাগর জানতেন যে, যতদিন পর্যন্ত দেশের নারীশক্তি শিক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ না হবে, যতদিন তারা অজ্ঞতার প্রতিমূর্তি হয়ে সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে থাকবে, ততদিন দেশে কোন প্রগতি সম্ভব নয়। স্ত্রীশিক্ষাকেই তিনি নারীমুক্তির প্রধান উপায় মনে করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাই ড্রিঙ্কওয়াটার-বীটন বা বেথুনের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন। তাঁদের দু'জনের যুক্ত প্রচেষ্টায় ৭ই মে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ফিমেল স্কুল পরবর্তী বেথুন ফিমেল স্কুল নামে বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনা এই প্রথম। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের

এই চেষ্টা নিয়ে সে সময়কার হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। রক্ষণশীল দল স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে নানা যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন, এমন কি নাট্যকার এবং কবিরাও এই নিয়ে নানা ব্যঙ্গ নাট্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ করলেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সংসার রসাতলে যাবে এই ছিল তাঁদের ভাব। অন্য দিকে প্রগতিশীল দল নারীশিক্ষার স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং নিজেদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ" মহানির্বাণ তন্ত্রের এই বাক্যটি বিদ্যালয়ের যে গাড়ীটি ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাতায়াত করত তার উপর বড় বড় হরপে লিখিয়ে দিলেন। বাক্যটির অর্থ হল কন্যাদেরও পুত্রের ন্যায় পালন করা ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত সময়ে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় ৩৫টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সব বিদ্যালয়ে ১,৩০০ ছাত্রী পাঠাভ্যাস করে। সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডেও স্ত্রীশিক্ষার এরূপ প্রসার হয় নি। কোল ও পোষ্টগেটের তথ্যানুসারে (*Vide* The Common People Cole, G.D.H. & Raymond Postgate, page 308) ১৮৪৬ এমন কি তারও বহু পরেও শতকরা ৫০ ভাগ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত ছিল। শিক্ষাদানে চার্চের প্রাধান্য থাকায় শিক্ষা ১৮৭৬-এর আগে জনসাধারণ্যে প্রসার লাভ করতে পারে নি। তা ছাড়া, শিল্প বিপ্লবের ফলে স্বল্প মজুরীতে শিশু ও স্ত্রী শ্রমিক নিয়োগ করাটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের শিক্ষার কথা ভাবাটা গৌণ ব্যাপারে পর্যবসিত হয়। এ সম্বন্ধে হ্যামণ্ড দম্পতির Town Labourer, Country Labourer, এবং গেলস-এর Condition of the Working People in England প্রভূত আলোকপাত করবে।

বিদ্যাসাগর যখন স্পেশাল ইন্‌স্‌পেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বিভিন্ন জেলায় তিনি বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়েছিলেন। ডি. পি. আই. ইয়ং সাহেব ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে নব প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়গুলির অর্থ সাহায্য দানে অসম্মত হন। বিদ্যাসাগর তখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে এই ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং কয়েকজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় তাঁকে এই বিষয়ে অর্থ সাহায্য করেন, তার মধ্যে সি. বীডন এবং এইচ. র‍্যাবনও ছিলেন। অবশেষে আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে ইয়ং সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন।

সরকারী কাজে পদত্যাগ করবার পরেও বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নি। তা সত্ত্বেও, বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে কাজের

জন্য শিক্ষয়িত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনা করার প্রস্তাবটি তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এই প্রস্তাব এসেছিল মিস মেরী কার্পেণ্টার, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখের কাছ থেকে। যেখানে বেথুন স্কুলে পড়বার জন্য দশ বৎসর বয়স্কা ছাত্রী পাওয়াই দুষ্কর, সেখানে নারীশিক্ষা বিরোধী হিন্দু সমাজের ভেতর শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া সহজ তো হবেই না বরঞ্চ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকার্যে ব্যাঘাত ঘটতে পারে মনে করেই তিনি তা সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মত ছিল শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষা ব্যাপার সরকারী প্রচেষ্টায় না হয়ে যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হয় তাতে সুফল আশা করা যেতে পারে। বরং কেউ এই শিক্ষাদানের কার্যভার গ্রহণ করলে তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য করলে সেটা সুবিধাজনক হবে। যাই হোক সরকারের প্রতিনিধিরা তাঁর মতামত গ্রহণ না করে বেথুন স্কুলের এক অংশে নর্মাল স্কুল উদ্ঘাটন করেন মাত্র পাঁচ-ছয়টি ছাত্রী নিয়ে, কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

যে কোন আচরণ যা অকারণে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে নারীশিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রতি বিদ্যাসাগরের কোন সমর্থন ছিল না। এই কারণেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মসংগীত গাইবার প্রচলনের চেষ্টা করার জন্য তৎকালীন সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ পিগটকে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

যদিও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সেক্রেটারীর পদটি ত্যাগ করেন তা সত্ত্বেও ছাত্রীদের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ বা আগ্রহ এতটুকুও কমে নি। বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা সর্বপ্রথম বাঙালী মহিলা, রামচন্দ্র বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী বসু যেদিন এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রিলাভ করলেন, সেদিন তাঁর সাফল্যে বিদ্যাসাগর বিশেষ আনন্দিত হয়ে চন্দ্রমুখীকে একখণ্ড সেক্সপীয়রের রচনাবলী উপহার দিয়েছিলেন।

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও কম উৎসাহী ছিলেন না। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় কলেজের নানা কাজের ভীড়ের মধ্যেও তিনি সমাজসংস্কারের চেষ্টায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন। বীরসিংহের গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে বসে একদিন তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে বীরসিংহের স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় তাঁর জননী সেখানে এসে একটি বালিকার সদ্য বৈধব্যের সংবাদ দিয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলেন, 'তুই এতোদিন এত শাস্ত্র পড়লি, তাতে বিধবার কি কোন উপায় নেই'? হিন্দু বিধবাদের বিশেষতঃ বাল্যবিধবাদের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর

কোমল অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল, তাই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকার ফলে দেশে যে ব্যাপক ব্যাভিচার ও নীতিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্বন্ধেও শাসনের তর্জনী তুলে ধরে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে রায় দেন। "বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যাভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যাভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলংক নিবারণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।"

তিনি দুটি পুস্তিকা রচনা করেন, তাতে পরাশর সংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। রাধাকান্ত দেবের গৃহে আহূত সভায় তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতাদের সামনে বিধবা বিবাহের যুক্তিযুক্ততা এবং শাস্ত্রের সমর্থন তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিণীসভা ও কলকাতা ধর্মসভার প্রবল বিরোধিতার মুখে ব্যর্থ হয়ে যায়। অল্প সংখ্যক কয়েকটি শিক্ষিত হিন্দু মাত্র তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন, তার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাপ চাঁদ বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর তাঁর ইংরেজি পুস্তিকা "Marriage of Hindu Widows"-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের বিধবা বিবাহের বৈধতা সম্পর্কে মত করান। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর কাউন্সিলে এ বিষয়ে তাঁর আবেদন স্বীকৃত হয় এবং রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতার মুখে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই বিধবা বিবাহ বিলটি গৃহীত হয় ও Act XV of 1856 -এর দ্বারা বিধবা বিবাহ আইনসম্মত বলে স্বীকৃত হয়। এই আইন অনুসারে যেমন বিধবার পুনর্বিবাহকে সিদ্ধ করা হয় এবং এরূপ বিবাহের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তেমনি পুনর্বিবাহের পর স্ত্রীর মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে কোন দাবীকে অস্বীকার করা হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সতীদাহ নিবারণ আইন যেমন বাধ্যতামূলক আইন, এ আইন অবশ্য সে রকম বাধ্যতামূলক নয়, যারা এই এই আইনের সুযোগ

লাভে ইচ্ছুক, তাদের ব্যবহারের জন্যই এই আইনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বিধবা বিবাহ সম্পন্ন করতে তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করে গেছেন। বহু লোক তাঁর কাছ থেকে বিধবা বিবাহের নাম করে ফাঁকি দিয়ে অর্থ সাহায্য নিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর ঋণ করেও বিধবা বিবাহের অর্থ জোগাড় করে দিতেন। ফলে, এই খাতেই তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় বিরাশী হাজার টাকা।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার চেষ্টার সঙ্গে বিদ্যাসাগর হিন্দুদের, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১ম) নামক পুস্তিকাতে কৌলীন্য প্রথায় নারী নির্যাতনের নিষ্করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

"কুলীন ভগিনী ও কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়।......প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তরবর্তী দীর্ঘকাল উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়াও তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃ-ভার্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাহারা সর্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

......উত্তর সাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা ও কুলীন দুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন। ফলতঃ কুলীন মহিলা ও কুলীন তনয়াদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। তাহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং যে হেতুতে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে"।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দু সংস্কার এতই প্রবল যে, আইন প্রণয়ন হওয়া সত্ত্বেও কার্যতঃ এই প্রথার বহুল প্রচলন সম্ভব হয়নি। এই প্রথার বিরোধীদল এমন কি গোপনে বিদ্যাসাগরের প্রাণ নাশের আয়োজন পর্যন্ত করেছিল। যাই হোক, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনকারীদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে কালীমতী দেবী নামে একটি বিধবার বিবাহ বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সম্পন্ন হয়। সুকীয়া স্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এই বিবাহ হয় এবং বিবাহের সময় গৃহের

চারিদিকে পুলিশ প্রহরা নিযুক্ত করা হয়। বিধবা বিবাহের অনেক সমর্থনকারীই সেদিন সামাজিক নির্যাতন ও রীতিমত দৈহিক উৎপীড়নের ভয়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁদের এই অনুপস্থিতিতে বিদ্যাসাগর বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি বিচলিত বা নিরাশ হন নি। এ বিবাহের প্রায় সমস্ত ব্যয় ভারই তিনি নিজে বহন করেছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে একটি বিধবার বিবাহ দেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ২৫,০০০ স্বাক্ষর সহ বহু-বিবাহ প্রথা বন্ধ করবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। আবেদনকারীদের মধ্যে মহারাজাধিরাজ মহতাপ চাঁদ বাহাদুরেরও স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব হয়নি। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী আর একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয় এবং বেঙ্গল কাউন্সিলে যাতে বহু-বিবাহ বন্ধ করার জন্য Indian Council Act-র সেক্সন ৪৩ অনুসারে বিল পাশ করা হয়, সেজন্য চেষ্টা চলে, কিন্তু তার কিছু দিন আগে সদ্য সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেছে, তাই সরকার এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করতে রাজী হন না। কেবল তাঁরা বিদ্যাসাগর প্রমুখ কয়েকজনের দ্বারা গঠিত কমিটির কাছে বিষয়টি উপস্থিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাতে যদিও অধিকাংশ লোকের মতই বহুবিবাহের বিপক্ষে দেখা যায়, তা সত্ত্বেও এই প্রথাকে আইন করে বন্ধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যাই হোক তাতেও বিদ্যাসাগরের উৎসাহ কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, তাতে বহুবিবাহ যে মনুসংহিতায় অনুমোদিত নয়, তা দেখিয়ে এই রীতি আইনতঃ বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাতে বহুবিবাহের দোষাবলী এবং যাঁরা এই কুপ্রথার সমর্থক তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি আইন প্রণয়নের দ্বারা এই কুপ্রথাকে বন্ধ করতে পারেন নি ঠিকই কিন্তু বহুবিবাহ যে সত্যিই শাস্ত্রসম্মত নয় এবং এই প্রথার যে বহু দোষ, তার সম্বন্ধে তিনি সমাজকে সচেতন করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্য বা শাস্ত্রকে উপেক্ষা করা তাঁর রীতি ছিল না, কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী বা সামাজিক অগ্রগতির অন্তরায় কোনও রীতি বা প্রথাকে কেবল মাত্র তা চিরাচরিত এই জন্য তাকে স্বীকার বা গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর ঋজু অথচ গভীর মতামত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি ঈশ্বরচন্দ্র। প্রায়শঃ গৌরী বধূদের

স্বামী সহবাসের প্রশ্নটি নিয়ে অত্যন্ত প্রবলভাবে আলোচনা চলেছিল এবং এ বিষয়টি বিল হিসেবে কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়, যাতে আইন করে বলপূর্বক সহবাসের ব্যাপারটি আইনতঃ দণ্ডনীয় হতে পারে। সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন, "I should like the measures to be so framed as to give something like an adequate protection to childwives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consumate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that sympton before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance."

ধর্ম, কৌলীন্য, সংস্কার, প্রথা আচ্ছন্নতা তখনও সজোরে বাংলা সমাজে বর্তমান। এই পরিবেশে বিবাহ ও তৎসংলগ্ন সংস্কারাদিকে সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ সেকুলার দৃষ্টিতে দেখার সাহস বিদ্যাসাগরেরই ছিল। কনিষ্ঠ বঙ্কিম অনেক প্রাগ্রসর মননের পরিচয় দিলেও এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে হার মেনেছেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের বোধি ও বুদ্ধির, মননের ও আবেগের পরিচয়।

শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য রচয়িতা ছাড়াও বিদ্যাসাগরের আর একটি পরিচয় ছিল, তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। দীন, দরিদ্র, দুঃখী, যার জন্য যতখানি সম্ভব তিনি অর্থ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে করে গেছেন, প্রতিদানে কোন কিছুই প্রত্যাশা করেন নি, এমন কি কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত না।

ছাত্র অবস্থায় যখন নিতান্ত অভাব-অনটনের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে, তখন নিজে ছুটির সময় যখন জল খেতে যেতেন, ছাত্র যারা উপস্থিত থাকতো তাদের তাঁর নিজের বৃত্তির অর্থ দিয়ে মিষ্টি কিনে খাওয়াতেন। দারোয়ানের কাছে টাকা ধার করে দরিদ্র ছাত্রদের নতুন কাপড় কিনে দিতেন। পুজোর ছুটির পর দেশে গিয়ে দেশের লোকদের মধ্যে যার অভাব দেখতেন, তার সে অভাব দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, 'অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন'।

সংস্কৃত কলেজে কাজ করবার সময় ব্যাকরণ অধ্যাপকের পদটি যখন খালি হয়, তখন বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সেই পদটিতে নেবার জন্য মার্সাল্ সাহেবকে অনুরোধ করেন। মিঃ মার্সাল বললেন, তাঁকে পদটি দেবার আগে জানা প্রয়োজন যে, তিনি সেই পদটি নিতে ইচ্ছুক কিনা। একথা শুনে বিদ্যাসাগর সেই দিনই পায়ে হেঁটে ত্রিশ ক্রোশ দূরে কালনাতে তর্কবাচস্পতির টোলের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পরদিন তর্কবাচস্পতির সম্মতি এবং প্রশংসাপত্রগুলি সহ ফিরে গিয়ে যথাসময় মার্সাল সাহেবকে সেগুলি দেন। পরোপকারের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত উৎসাহ ও শক্তি নিয়োগ করতে এতটুকুও পিছপাও হতেন না।

একবার একজন ইনকামট্যাক্সের কর্মচারী অন্যায়ভাবে জাহানাবাদ মহকুমার তিনজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর উপর আয়কর ধার্য করেন। জানতে পেরে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ খাড়ার গ্রামের আসেসারের কাছে যান। তিনি এ বিষয়ে কিছু না করায় বিদ্যাসাগর কলকাতায় গিয়ে লেফটনেণ্ট গভর্নরের কাছে বিষয়টি উপস্থিত করে বিচার প্রার্থনা করেন। গভর্নর বর্ধমানের কালেক্টর মিঃ হ্যারিসনকে তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর নিজে হ্যারিসন সাহবের সঙ্গে গ্রামে ঘুরে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত অন্যায় নিবারণে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের কারুণ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাঁর "কারুণ্য বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত এই জন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার, তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না—একেবারে দ্রুতপদে, ঋজু রেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাকে রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই।" একবার তিনি যখন কার্মাটারে ছিলেন, তখন একটি মেথর জাতীয়া রমণীর ওলাওঠা হয়। বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর কুটিরে গিয়ে বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে তার সেবা করেছিলেন। যখন তিনি বর্ধমানে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানদের আত্মীয়ের মতন যত্ন করেছেন। অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের রুক্ষ কেশ তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক করায় তিনি তাদের জন্য তেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। যিনি তেল দিতেন তিনি এই সব হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নীচু জাতের স্ত্রীলোকদের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে অনেক দূর থেকে তেল বিতরণ করতেন। এই দেখে বিদ্যাসাগর নিজ হাতে যত্নের সঙ্গে তাদের মাথায় তেল মাখিয়ে দেন।

দয়ার্দ্রহৃদয় বিদ্যাসাগর সাধারণ মানুষের আর্থিক অসুবিধার কথা চিন্তা করেই হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের পরিকল্পনা করেছিলেন। অবশ্য

এ কথা বলা যায় যে, তাঁর এই ধারণাটি রামমোহনের ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছিল। তবুও প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে কলকাতা শহরে হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফন্ডের প্রবর্তন হয়। স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ মৃত্যুকালে পরিবার-পরিজনের জন্য কোন রকম আর্থিক সংস্থান সাধারণত করে যেতে পারতেন না। ফলে, পরিবারের লোকজনের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হত। এই অবস্থা নিরাকরণ উদ্দেশ্যেই এই ফন্ডের প্রবর্তন করেন ঈশ্বরচন্দ্র। সোস্যাল সিকিওরিটির আনুষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা এর পূর্বে ইউরোপেও দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাত্র তিন বছর এই প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত থেকে ঈশ্বরচন্দ্র এই সংস্থার সংগে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দেশবাসী তাঁর এই প্রচেষ্টার পিছনে স্বার্থসাধনের দুরভিসন্ধি খুঁজে বের করেছিল। তাই অত্যন্ত দুঃখেই তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁর নিজের ভাষায়—

"নিজের স্বার্থ সাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

......যাঁহাদের আপনারা পরিচালন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এই ফন্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।"

তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বিলেতে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্টে পড়েছিলেন, তখন বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্যই তাঁকে সে সংকট থেকে মুক্ত করেছিল। দেশে ফেরার পর তাঁর সাহায্য ও সহৃদয়তাই মাইকেলের প্রতিভাকে বিকাশ লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন বিদ্যাসাগরের কাছে একটি পত্রে তিনি লেখেন, "আমি বেঁচে থেকে যখন দেশে ফিরব, তখন আমার দেশবাসীকে বলব যে, তুমি শুধু বিদ্যাসাগরই নও, তুমি করুণাসাগর"। বিদ্যাসাগরের চরিত্র বর্ণনায় তিনি বলেন যে, প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি ও উদ্যম এবং বাঙালী মায়ের অন্তর এই তিনের সমন্বয় দেখা যায় তার চরিত্রে।

১২৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে তিনি এই মরলোক ত্যাগ করে অনন্তলোকে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে

মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায় সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোন প্রলোভনে দক্ষিণে-বামে কেশাগ্র পরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্ত বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে সমগ্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অংকুরিত হইয়া প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস শাখাপল্লব-সমন্বিত সবল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে, তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সবল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত এবং সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ

আধুনিক বাংলা যাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজচিন্তার ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে প্রগতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে যে তিনটি নাম আমরা আলোচনা করার জন্য বেছে নিয়েছি, তার কনিষ্ঠতম সূরী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর জীবনকথা একাধারে বিপ্লবী বীর, ত্যাগী সন্ন্যাসী, মানবপ্রেমী সাধক, নির্ভীক দেশব্রতী, দৃপ্ত সমাজ সংস্কারকের পুণ্য কাহিনী। স্বদেশী যুগের তরুণদল যে নির্ভয় অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশমাতৃকার পায় আত্মবলি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, সমগ্র চিন্তাধারাকে স্বদেশ অভিমুখী করেছিলেন, অন্যায় অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শপথ নিয়েছিলেন—তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কাজেই এযুগের বাঙালীর সমাজচেতনার সম্যক্ পরিচয় বুঝতে গেলে স্বামীজীর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। সংক্ষিপ্ত আলাপের মধ্য দিয়ে তারই কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা এখানে আমরা করব।

উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে দত্তবংশের বিশাল ভবনের জীর্ণ অবশিষ্ট আজও অগণিত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে। প্রতিষ্ঠাবান্ আইনজীবী রামমোহন দত্ত ইংরেজ আমলের প্রথম অবস্থায় প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, যার ফলে অনেকেরই বিস্ময় এবং ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই দত্ত বংশ। রামমোহনের পুত্র দুর্গাচরণ পিতার অনুগামী হয়ে তরুণ বয়সেই আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর বৈরাগ্যদীপ প্রজ্বলিত। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তখনকার দিনের নতুন কলকাতার অপরিমিত ভোগবিলাস আর ধনী গৃহের সকল সংসার সুখের আকর্ষণ পরিত্যাগ করে, স্ত্রী পুত্র পরিজন পশ্চাতে ফেলে রেখে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাসের প্রথানুযায়ী বারো বছর পরে একবার যখন তিনি জন্মভূমি দর্শনে আসেন, তখন তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ বালক। সন্ন্যাসীর পুত্র এই বিশ্বনাথই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পিতা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই স্বামীজী এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে বৈরাগ্য এবং বৈভব পাশাপাশি ধারায় বয়ে চলেছে। বিত্তশালী রামমোহনের পুত্র বৈরাগ্যবান্ দুর্গাচরণ আবার তাঁর পুত্র ঐশ্বর্যবান্ বিশ্বনাথের পুত্র যুগপ্রবর্তক ত্যাগিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ।

বিশ্বনাথ দত্ত একাধারে ছিলেন সুদক্ষ আইন ব্যবসায়ী আবার অসাধারণ বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী। অনেক অভিজাত মুসলমান ছিলেন তাঁর মক্কেল, অনেক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। আচারে ব্যবহারেও তিনি অনেক মুসলমানী আদব কায়দা মেনে চলা পছন্দ করতেন। আবার খৃষ্টধর্মের অনুরাগে তিনি বাইবেলও পাঠ করতেন। বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামি তো ছিলই না, বরং একটা আগ্রহ ছিল।

কিন্তু পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন প্রাচীন পন্থী হিন্দু মহিলা। সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যহ নিজ হস্তে শিবপূজা করতেন। তাঁর ধর্ম-পরায়ণতার প্রভাবে পরিবারের অন্যান্য মহিলারাও সুসংযত ধর্মজীবন যাপন করতেন।

ধনশালিনী স্বামিসৌভাগ্যবতী এই মহিলার অন্তরে শুধু এক ক্ষোভ ছিল—একটি পুত্র-সন্তানের অভাব। পুত্রকামনায় তিনি বিশ্বেশ্বর মহাদেবের আরাধনায় কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত ধারণ করলেন। তপস্যার ফলস্বরূপ দৈব ইচ্ছায়ই যেন তাঁর ক্রোড়ে জন্মলাভ করলেন মানবদেহে এক দেবশিশু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, পৌষ মাসের শেষ মকরসংক্রান্তির দিন ঊষাকালে। মায়ের ইচ্ছায় শিশুর নামকরণ হলো বীরেশ্বর, অন্নপ্রাশনে নাম রাখা হলো নরেন্দ্রনাথ। বীরেশ্বর পরিবারে পরিচিত হলেন বিলে নামে। আর নরেন্দ্রনাথ পরিণত হলেন, পরিপূর্ণ হলেন বিবেকানন্দে।

'শিবশিব' বলে অশান্ত-দুর্দান্ত শিশু নরেন্দ্রনাথের মাথায় জলের ছিটে দিয়ে শান্ত করা, খেলাচ্ছলে ধ্যানের অভিনয় করতে করতে বালক নরেন্দ্রের সমাধিস্থ হয়ে যাওয়া, বিধর্মীর জন্য নির্দিষ্ট হুঁকায় টান দিয়ে হিন্দুর জাত কি করে যায় তার পরীক্ষা করা, উদ্যত ফণা সাপের সামনে বিলুপ্তচেতনা নরেন্দ্রনাথের ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকা—এসব কাহিনী সর্বজনবিদিত। সুতরাং এসব ঘটনার পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু জন্মাবধি নরেন্দ্রনাথের জীবনে যে অনন্যসাধারণত্ব প্রকট হয়েছিল, সেটুকু বোঝাবার জন্যই এ প্রসঙ্গ স্মরণ করা।

যে পরিবেশে বড় হয়ে নরেন্দ্রনাথ উত্তরকালে বিবেকানন্দ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছিলেন, তা শুধু পারিবারিক নয়, তৎকালীন সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবেশেও তাঁকে প্রণোদিত করেছিল তাঁর ইষ্টচিহ্নিত পথে চলতে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ, হিন্দু ও মুসলমান—তার এই দুই বিপরীত ধর্মানুসরণকারী বিপুল জনতাকে নিয়ে এক রকম বিনা প্রতিবাদেই ইংরেজ বণিক্ শাসকের পদানত হয়ে পড়ল। মুসলমান শাসনকালেও হিন্দু সমাজ যতটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, ইংরেজের

অভিনব শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার সম্মুখে তার পক্ষে সে স্বকীয়তা বজায় রাখা অসম্ভব হলো। এর প্রধান কারণ, প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তখন তার অর্থহীন লোকাচার, সংকীর্ণ হৃদয়হীন জাতিভেদপ্রথা আর বাবুশ্রেণীর অপর্যাপ্ত ভোগবিলাসের চাপে জড় পিণ্ডবৎ হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ই ভারতের বিশেষ করে বাংলার অন্ধকার আকাশে অগ্নিসত্ত্ব রাজা রামমোহনের আবির্ভাব। জাতির মৃতপ্রায় জীবনে দেখা দিল প্রথম সঞ্চালন। সূচনা হলো আধুনিক যুগের। কিন্তু আধুনিকতা একদিকে যেমন হিন্দুর জাতীয় জড়তায় ফাটল ধরালো, অন্যদিকে তেমনই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তায় ইংরেজী শিক্ষানবীশ যুবসম্প্রদায়ের উচ্ছৃংখলতা চরমে উঠল।

এই দুয়ের মধ্যে—প্রাচীনপন্থী হিন্দুয়ানি আর সভ্যতার নামে অনাচারের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উদয় হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামী, দুঃস্থ অনাথ অবলার প্রতি করুণা বিগলিত, সংস্কৃত জ্ঞানের অগাধ বারিধি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অবাধ অধিকার—এই বৈপরীত্যের মধ্যে স্বীয় গরিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর।

নাগরিক সভ্যতার অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যখন সমগ্র বাংলাদেশ বিহ্বল, তখন সহরের উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণিপ্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম্য নিরক্ষর দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ ভারতের সর্বলোক-কল্যাণকর পারমার্থিক আদর্শকে বিকৃতি ও বিস্মৃতির থেকে উদ্ধার করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

উদরান্নের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে পূজারীর ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু অবিরত তাঁর চিন্তা ছিল, সত্যই কি জগন্মাতা আছেন? জগন্মাতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশায় তন্ময় সাধক বাহ্য জগৎ ভুলে গেলেন। দিন, মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল—দিব্যভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাহ্যদশাশূন্য হয়ে রইলেন। ক্রমে মৃণ্ময়ী মহাদেবী চিন্ময়ীরূপে উদ্ভাসিত হলেন তাঁর চিদাকাশে। সকল মতের সকল পথের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এসে মিলিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাব যখন হিন্দু সমাজের পুরোনো রীতি ও সামাজিক ব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, তখন সেই সংকটের সমাধানের জন্য ভারতের কয়েকজন চিন্তাশীল নেতা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য প্রয়াস পান। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, যদি যুগধর্মকে অস্বীকার করে এই সামঞ্জস্য করে না

নেওয়া যায়, তবে হিন্দু সমাজের ও সভ্যতার ওপরে শুধু আঘাতই পড়বে না, হয়ত বা ভারত থেকে সময়ে হিন্দুসংস্কৃতিই লোপ পেয়ে যাবে।

বাংলার হিন্দুসমাজের ওপরেই এই প্রভাব সব চেয়ে বেশী পড়েছিল। এই প্রভাবের ফলে, শুধু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরাই নয়, সাধারণ মানুষেরাও দলে দলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। এই জাতীয় সংকট থেকে হিন্দুসমাজকে মুক্ত করবার কাজে প্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়ে রাজা রামমোহনের আদর্শ অনুসরণ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণও এগিয়ে এসেছিলেন। এর ফল সুদূর প্রসারী হলেও দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই ধর্ম-সংকটের সমাধানকল্পে ধর্মসমন্বয়ের উদার আদর্শ প্রচার করেন। বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমত অবলম্বন করে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুঝতে পারেন যে, সমস্ত ধর্মের মূলগত আদর্শ এক শুধু মানুষই বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে চলে, তাই তিনি বললেন, "যত মত, তত পথ"।

পরমহংস দেব বুঝেছিলেন যে, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মভিত্তিক। সুতরাং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে ধর্মের ওপর নির্ভর করেই তা করতে হবে, নইলে অন্য কোন ভাবেই তা সম্ভব হবে না। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পরমহংস দেব ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রচারের জন্য এগিয়ে এলেন। এই আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সে যুগের বহু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকবৃন্দ পরমহংস দেবের উপদেশপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে যাতায়াত সুরু করেন।

এমনি যখন বাংলার সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ, তখন নরেন্দ্রনাথ বাল্য এবং কৈশোর পেরিয়ে তেজোদৃপ্ত যৌবনে পদার্পণ করলেন। তিনি কোন দিনই তথাকথিত ভাল মানুষ শান্তশিষ্ট ছিলেন না। গতানুগতিকতা তাঁর জীবনের প্রবল গতিমুখে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। বিপুল প্রতিভার অধিকারী নরেন্দ্রনাথ, ছাত্র সুহৃদ্ এবং শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা সম্মান এবং প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। এফ.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালেই দর্শন-শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অভিনিবেশ লক্ষ্য করে জেনারেল এ্যাসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব বলেন— "He is an excellent philosophical student. In all the German and English Universities, there is not one student as brilliant as he is."

কিন্তু সত্যানুসন্ধী নরেন্দ্র জ্ঞানপিপাসা নিয়ে যতই অগ্রসর হতে লাগলেন, ততই অনুভব করতে লাগলেন যে চরম সত্য লাভ করতে গেলে কেবলমাত্র বুদ্ধি বিচারের সাহায্য নিলে চলবে না, উপলব্ধির প্রয়োজন। কিন্তু কার বা কিসের সহায়তায় তা পাওয়া যেতে পারে? এই আগ্রহ এবং আকুলতা নিয়ে তিনি অনেক সাধকের সন্নিধানে গেছেন, ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী হয়েছেন, কিন্তু "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি"—এ প্রশ্নের সদুত্তর তিনি কোথাও পান নি। না পেয়ে অন্তরের ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

এই সময়ে নানা ঘটনা সন্নিবেশে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। উৎসমুখ খুলে যায় এক যুগান্তকারী ভাবস্রোতের।

শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজে নরেন্দ্রের বহু জিজ্ঞাসিত "আপনি কি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দর্শন করেছি। তোমাকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তাঁকে আমি দেখেছি। তুমি কি দেখতে চাও? যদি আমি যেমন ভাবে বলব সেইভাবে তুমি চল, তবে তোমাকেও দেখাতে পারি।"

শুধু এই কথাতেই নরেন্দ্রনাথের সব সংশয় দূর হয় নি, নানাভাবে তাঁর প্রেম ভক্তি নিরাসক্তি ঈশ্বরানুভূতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তবেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে, জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে, একাধারে পিতামাতা অবিচল অকৃত্রিম বন্ধুরূপে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ধীরে ধীরে তাঁর অন্তর আপ্লুত করতে থাকে। বৈরাগ্য গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বিবাহের প্রস্তাব, অর্থোপার্জন, সংসার বন্ধন সব প্রত্যাখান করতে থ্যকেন তীব্র বিতৃষ্ণায়।

এমনই যখন তাঁর জীবনের গূঢ় পরিবর্তন সূচিত হলো, তখনই অকস্মাৎ ঘটল পিতা বিশ্বনাথ দত্তর তিরোধান। সমগ্র জীবনের পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে গেল। পিতা দুহাতে উপার্জন করে দুহাতে বিতরণ করে গেছেন তাঁর ঐশ্বর্যসম্পদ, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় বলে রেখে যান নি কিছু। এ অবস্থায় ছোট ছোট ভাইবোন আর বিধবা মাকে নিয়ে চিরকালের সংসারবিমুখ নরেন্দ্রনাথকে সংসারের দুর্বিপাকে নিদারুণভাবে জড়িয়ে পড়তে হলো। এদিকে অর্থাগমের সুযোগ হয় না, ওদিকে আত্মীয়স্বজনের নানা রকম বিরোধিতা। দুঃসহ কষ্টে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মুক্তির পথ দেখালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অনুরোধে বারবার মন্দিরে গিয়েও মা ভবতারিণীর কাছে বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি ছাড়া আর কিছু নরেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করতে পারলেন না। এতদিন যাঁকে মৃণ্ময়ী বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, আজ তাঁর চিন্ময়ীরূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর কাছে সব ক্ষুদ্র আশা-

আকাঙ্ক্ষা বাসনা-কামনা তুচ্ছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে আশ্বাস দিলেন, "মায়ের কৃপায় মোটা ভাত কাপড়ের অভাব তোর পরিবারের হবে না।" নরেন্দ্রনাথ অন্তরে স্বস্তি পেলেন, মন ভাবনাশূন্য হলো।

প্রথম সাক্ষাতেই পরমহংস দেব তাঁর সাধনালব্ধ ঐশ্বরিক শক্তিবলে বুঝতে পারেন যে, এই সৌম্যকান্তি যুবক নরেন্দ্রনাথই তাঁর প্রচারিত ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রচার এবং জনসমাজকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারবে। পরমহংস দেব নরেন্দ্রনাথকে এই ধর্মমতের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। নরেন্দ্রনাথও এই উদার মত প্রচার করে বিশ্বের আধ্যাত্মিক বিরোধ দূর করবার জন্য প্রয়াস পেলেন।

পরমহংস দেব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কালে বলেছিলেন—"এক্ষণে বিশ্বে এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, যাহার মধ্যে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিরাজমান থাকিবে। এইরূপ এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু বর্ষব্যাপী সেই মহাপুরুষের চরণতলে উপবেশনপূর্বক শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।......এই মহাপুরুষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। এই মহাপুরুষ কথিত সমন্বয়ের সমুন্নত আদর্শ বিশ্বমানবের সর্বপ্রকার মতবিরোধ দূরীভূত করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবে। যুগ যুগ ধরিয়া এই মতবিরোধ জগতের মহা অনিষ্টসাধন করিয়াছে এবং ইহা নররুধিরে জগতের বক্ষ প্লাবিত করিয়া বহু পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসসাধন করিয়াছে। সুতরাং অচিরেই যদি এই মতবিরোধের অবসান না হয়, তবে বিশ্বের ধ্বংস সুনিশ্চিত।"

এই উদার মত প্রচারের কাজে স্বামী বিবেকানন্দ আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছিলেন। এই মত প্রচারের ফলে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশেও বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তি স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তরূপে পরিগণিত হন।

ভারতবর্ষের ঐ যুগসন্ধিক্ষণে পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব না ঘটলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অস্তিত্ব থাকলেও তার গরিমা রক্ষা পেত কি না সন্দেহ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মরদেহ ত্যাগ করেন। তার আগে নরেন্দ্র-নাথকে আকারে ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি অবহিত করে গেছেন মানব-সেবার বিশ্বপ্রেমের কি পন্থা তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, তাঁর অন্যান্য ত্যাগী গুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ বালক সন্ন্যাসীর দলকে নেতৃত্ব দিয়ে কেমন করে একটি বিশ্বজনীন সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। কাশীপুরের বাগান বাটীতে এই বালক ক'জন শ্রীগুরুর সেবার ভার গ্রহণ করে, কখনও

দিনরাত অতিবাহিত করতেন, কখনও গৃহে ফিরে যেতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হবার পর নরেন্দ্রের ইঙ্গিতে গৃহ-সংসার ছেড়ে তাঁরা সমবেত হলেন বরাহনগর মঠবাড়ীতে। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অসহনীয় ক্লেশ তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। তবু অধ্যাত্ম সাধনার আনন্দ আর মাধুর্যে তাঁরা আত্মহারা হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। নরেন্দ্র তাঁদের নেতা।

ক্রমে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে জানবার বুঝবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের প্রবল হয়ে উঠল এবং এই উদ্দেশ্যে এক-একজন করে মঠবাড়ী পরিত্যাগ করে বিভিন্ন তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ তখন স্বামী বিবেকানন্দ। এই পরিভ্রমণ কালেই তিনি চিনলেন জানলেন নানাভাবে ভারতের সত্তাকে। কখনও করেছেন সাধুসন্তের সঙ্গ, কখন নিমগ্ন থেকেছেন গভীর ধ্যানে অরণ্যে, পর্বতকন্দরে, কখনও ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগরে, বন্দরে। রাজা-মহারাজা, দীন-দরিদ্র, পণ্ডিত-আচার্য, নিরক্ষর-নিপীড়িত জনতা, আধুনিক শিক্ষাভিমানী, সনাতন শাস্ত্রবিশ্বাসী সরল দেশবাসী সকলের অন্তরের দরজায় দরজায় ঘা দিয়ে ফিরতে লাগলেন স্বামীজী।

ডাক দিলেন দেশের মানুষকে—"মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" শোনাতে লাগলেন সকলকে ভারতীয় ধর্মের শাশ্বত বাণী অনাহত সত্য। শুনতে লাগলেন নিজে কোথায় বাধা পেয়ে দেশের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে এসেছে, ভাবতে লাগলেন কি এর প্রতিকার। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই জাতিকে ঐহিক উন্নতির পথে এগিয়ে না নিয়ে, পারমার্থিক উন্নতির চেষ্টা করলে তা বিফল হতে বাধ্য।

এই উদ্দেশ্যেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু সমাজের সর্বাপেক্ষা হীন গ্লানি অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের জাতটা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। এজন্যই ভারতে এত দুঃখ-কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের যাতে বিকাশ হতে পারে তাই করতে হবে। নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলছে। যদি ভারতের উন্নতি করতে হয়, তাহলে তথাকথিত নীচু জাতিকে মর্যাদা দিয়ে তাদের সম্মানের আসনে নিয়ে বসাতে হবে।

কিন্তু তাঁর বিশাল প্রাণ, বিপুল শক্তিমত্তা শুধু দেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। অন্তরে ধীরে বেজে উঠল বিশ্বের আহ্বান আর বহির্জীবনে ঘটল এমনই ঘটনাপরম্পরা যার প্রেরণায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য গৌরবে সমুন্নতশির স্বামী বিবেকানন্দকে শিকাগো ধর্ম মহাসভায়

যোগদানের জন্য বোম্বাই বন্দর থেকে ভারত ত্যাগ করে মহাসাগরে পাড়ি দিতে হলো।

আমেরিকায় পেঁাছে প্রথমে তাঁর নিরাশ্রয় অবস্থায় কষ্ট ও অপমান সহ্য করা, তারপর ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতা প্রদান, আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয়, সনাতন ধর্মের মর্মবাণী বিদেশীর অন্তরে প্রবিষ্ট করা, ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মবাদের বিজয় পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীন করা এবং এ সবের জন্য দেহপাত করে পরিশ্রম স্বীকার করা—এ নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রভূত আলোচনা এবং গবেষণা হয়েছে। নতুন করে এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ এবং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যাত্মদিগ্বিজয় শেষ করে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফেরার পর স্বামীজীকে দেশের মানুষ নতুন করে দেখতে শিখল, ভাবতে শিখল। স্বামীজীও ভারতকে পুনরায় দেখবার জন্য বহির্গত হলেন। তাঁর জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাসের শানিত তরবারি নিয়ে তিনি সমাজের সকল কুসংস্কার, ধর্মের সকল অন্ধতা, মানুষের মনের সকল দুর্বলতা ছিন্নভিন্ন করতে ঝাঁপ দিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, ভারতের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূরীকরণ, পদদলিত মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শিক্ষাদান—এই সুপবিত্র দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশের মানুষকে সচেতন, জাগ্রত করবার জন্য তিনি দিনের পর দিন উপদেশ দিয়ে, ভাষণ দিয়ে, নিজ হাতে কাজ করে যেতে লাগলেন দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু অকাতরে ব্যয় করে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বেলুড়মঠের জমি ক্রয় করা হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ বিস্তারের সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিতের ভিতর দিয়ে স্বামীজী দেশকে দিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি কত মহান্ হতে পারে, কত বিরাট দায়িত্ব বহন করতে পারে, নবযুগজীবনে তার দৃষ্টান্তস্বরূপই যেন স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন "রামকৃষ্ণ মিশন"। এ যুগ সঙ্ঘশক্তির জয়যাত্রার যুগ। একক প্রচেষ্টা, এক-নায়কত্ব, এককের প্রভাব—এ যুগকে স্পর্শ করে কম। পল্লীভিত্তিক থেকে বিশ্বভিত্তিক পর্যন্ত সমন্বয় আর সহযোগের মধ্যেই সব পরিকল্পনা রূপায়িত হবার সুযোগ খোঁজে। যুগাচার্য স্বামীজী যেন সেই যুগপ্রয়োজনেরই উত্তর দিলেন রামকৃষ্ণ মিশন পত্তন করে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রেজিষ্ট্রি হয় মিশন। কিন্তু স্বামীজীর আদর্শে মিশনের কর্মধারা আরম্ভ হয়, তার অনেক আগেই। সে আদর্শ ছিল "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। কোন ত্রাণকার্যে যখন কর্মিদল প্রেরণ করা হতো, স্বামীজীর বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের কাছ থেকে তাদের প্রতি নির্দেশই থাকত—"তোমরা যাচ্ছ বীর সৈনিকের মত দেশ জয় করতে, হাতে স্বামীজীর নিশান নিয়ে।

স্বামীজী তোমাদের প্রধান নায়ক, তোমরা তাঁর অধীনে পদাতিক, যাও। দেখো, যেন শুধু চাল, কাপড় দিয়েই ফিরে এস না। স্বামীজীর ভাব অবলম্বন করে, সেখানকার অধিবাসীদের নারায়ণবোধে সেবা করবে। জাতি-ধর্মশ্রেণীগত কোনো ভেদবুদ্ধি যেন তোমাদের মধ্যে না আসে।"

সঙ্ঘের মাধ্যমে জনসেবা ও সমাজসেবার উচ্চ আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশন দেশে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন সন্দেহ নেই। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে ত্রাণকার্যে, হাসপাতাল চিকিৎসাগার স্থাপনে, যুগোপযোগী বহু ধরনের শিক্ষায়তন পরিচালনায়, আন্তর্জাতিক মিলন কেন্দ্র, আলোচনা চক্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায়, পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে সহরে নানাভাবে জনসংযোগের সাহায্যে দেশে সুস্থ জনজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মিশনের নিরলস নিঃস্বার্থ কর্মিবাহিনী।

আজ দেশের নানা জায়গায় নানা প্রকৃতির যে সব সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, তাদের অনেকেরই মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে, পথ দেখিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম এবং সেবার আদর্শ। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠছে, দেশপ্রেম জনগণের মনে নতুন সাড়া জাগাচ্ছে, তখন দেশ এবং জনগণের সেবায় উদ্বুদ্ধ অসংখ্য যুবক মিশনের স্বেচ্ছাসেবী কর্মী হিসাবে যোগ দিয়ে অক্লান্ত কাজ করে গেছেন। বিপন্ন মানুষের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিরা আশার আলো নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তবে স্বামীজীর মনে এই স্বপ্ন ছিল যে, যেদিন ভারত স্বাধীন হবে, জনকল্যাণের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের উপর তুলে নেবে, সেদিন ত্রাণকার্য পর্যায়ে মিশনের সমাজসেবামূলক কাজ কমে যাবে, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনায় মিশন তখন আত্মনিয়োগ করবে। স্বামীজীর এই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মিশনকর্মীরা আজও কাজ করে যাচ্ছেন।

চিন্তা করে দেখলে বৌদ্ধসঙ্ঘের পরে রামকৃষ্ণ মিশনই ভারতের নিজস্ব বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা সঙ্ঘের মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। সে দিক্ দিয়ে এ যুগের ভাবধারায় স্বামীজীর এবং তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এ অবদানের বিশেষ মূল্য আছে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী আর একবার ইয়োরোপ-আমেরিকা যাত্রা করেন। ভারতের সনাতন বাণীর প্রচারকার্য সেখানে যাতে আরও দৃঢ়ভিত্তিক হয়, বেদান্তের সত্য হয় আরও অন্তরঙ্গ—সে বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য কখনও শিথিল হয় নি, প্রচেষ্টার ছিল না কোন বিরাম। নিজে ভাষণ দিয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন

অজস্র অক্লান্ত। বিতর্কসভায় আলোচনাসভায় যোগদানে, শিষ্য-শিষ্যাদের উপদেশ প্রদানে তাঁর শ্রান্তিবোধ হয় নি কখনও। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অপ্রত্যাশিত-ভাবে তিনি ফিরে আসেন বেলুড়মঠে। বিদেশ থেকে তিনি যা সম্পদ্ আহরণ করে আনেন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মনির্ভরতা, অজানাকে জয় করার সাহস, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি—সবই দেশের কল্যাণার্থে সমর্পণ করতে চান। স্বামীজীর সুবৃহৎ রচনাবলী তাঁর চিন্তাধারার মাত্র আংশিক পরিচয় ধারণ করে রাখতে পেরেছে।

কিন্তু ক'বছরের অত্যধিক শ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভগ্ন হতে থাকে। তাতেও তাঁর ভ্রমণ বা বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদানের কোনো বাধা সৃষ্টি হতে দেন নি! ফলে ধীরে ধীরে শরীর দুর্বল থেকে দুর্বলতর, রোগ যন্ত্রণায় কাতর থেকে কাতরতর হতে লাগল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। বেলুড়মঠে গুরুভ্রাতা ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলীকে নানা কথা ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তাঁর মরলীলা সংবরণের আভাস দিচ্ছেন—বুঝেও কেউ বুঝছেন না, শুনেও কেউ শুনছেন না। শেষে এল সেই মহামিলনের লগ্ন। রাত্রি ন'টা। সেবক ব্রহ্মচারী বাতাস করছেন। জপমালা হাতে অমৃত আত্মা স্বামীজী শায়িত। একবার হাতখানি কেঁপে উঠল। শিশুর অস্ফুট ক্রন্দনের মত একটু কম্পিত স্বর কণ্ঠ থেকে নির্গত হলো। বুঝি বিশ্বমানবের বেদনায় ব্যথিতের ক্রন্দন। মহাসমাধিতে লীন হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আখ্যাত সপ্তর্ষিলোকের এক ধ্যানমগ্ন ঋষি, মানবকল্যাণে যাঁর দেহ ধারণ।

কে ছিলেন এই স্বামীজী, তা সম্যক্ বোঝা হয়তো আজও দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। শুধু মহাযাত্রার পূর্বদিন স্বামীজী একবার স্বগতোক্তি করেছিলেন, "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহলে সে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করেছে। কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্ম-গ্রহণ করবে"।

আগামী যুগের প্রতি এই স্বামীজীর শেষ বাঙ্ময় আশীর্বাদ। জ্ঞান প্রেম কর্ম দেশপ্রীতি মানবহিতৈষণা আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ প্রতীক স্বামীজির উত্তরাধিকার কে গ্রহণ করবেন, আজও তার পথ চেয়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে আছে।

——o——

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্তাবনা ঃ

মানব সভ্যতা গতিশীল। যুগ থেকে যুগান্তরে নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে তার গতি। প্রতি যুগ নিয়ে আসে তার নিজস্ব চাহিদা, নিজস্ব জীবনদর্শন। এই চাহিদা ও জীবনদর্শন সমাজ ও সংস্কৃতির বহিরাবরণের অন্তরালে যে বিশ্বাস, আদর্শ ও স্পৃহা নিহিত থাকে, তাকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত করে। চিন্তাজগতের, মানসলোকের পরিবর্তনের রূপই আমরা প্রতিফলিত দেখি জাতির সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে।

অতীতের দিকে চেয়ে দেখলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের যে দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র জেগে ওঠে, তা সত্যিই দুঃখজনক। চোখে পড়ে চিন্তার জগৎ, বিচারবুদ্ধির জগৎকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে এক ঊষর জড়তা। নদী যখন তার স্বাভাবিক গতি হারায়, তখন তা ক্রমশঃ বদ্ধ জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। স্রোতোহীন বদ্ধ জলে জমে ওঠে শৈবাল ও নানা আগাছা, জল হয়ে ওঠে দূষিত। তখনকার হিন্দু সমাজও স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে গতি হারিয়ে হয়ে পড়েছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত। নানা অর্থহীন আচার, কদাচার ও কুসংস্কার সমাজ জীবনকে ক্লিষ্ট করে তুলেছিল। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ কুলীনদের মধ্যে। উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ তো ছিলই, উপরন্তু সহমরণের রীতিও ছিল। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো জোর করেই সদ্য বিধবাকে তার মৃত স্বামীর চিতায় দাহ করা হ'ত কিন্তু সহমৃতার প্রতি এমন একটা ত্যাগের আদর্শ ও মর্যাদা আরোপিত হত, যার ফলে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হবার দৃষ্টান্তও দুর্লভ ছিল না। হিন্দু সমাজের পবিত্রতা ও আদর্শ রক্ষার ভার যেন নারী জাতিরই দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে অজস্র বিধি নিষেধের সহস্র পাকে তাদের জীবনের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখার রীতি ছিল। না ছিল তাদের স্বাধীনতা, না ছিল তাদের স্থান পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে। অন্য দিকে পুরুষদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। তাদের যে কোন পদস্খলনকে বিশেষ হাল্কাভাবে দেখা হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সমাজ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই—নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয়

ছিল না, বরং পাঁচজন বন্ধুবান্ধব একসঙ্গে বসলে, এ ধরনের ব্যক্তিদের কুশল এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হ'ত। ধনীদের মধ্যে পুজো বা পালপার্বণে কে কত বেশি খরচ করতে পারে, তার একটা প্রতিযোগিতা চলত। বাইজীদের অভ্যর্থনা করে নাচ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয় ছিল এবং কে কত ব্যয় করে কোন বিখ্যাত বাইজী এনেছে, তারও প্রতিযোগিতা চলত। বিদেশিনী ও যবনী বারবনিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া, দেশী সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা উপায় স্বরূপ ছিল। এই সময় মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদের মধ্যে বাবু নামে এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এরা পারসী ও অল্প ইংরেজি শিক্ষার ফলে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হয়ে ভোগ-সুখে দিন কাটাত। ঘুড়ি ওড়ান, বুলবুলির লড়াই দেখা, সঙ্গীতচর্চা, কবি, পাঁচালী ইত্যাদি শোনা এবং বারাঙ্গনাদের নিয়ে প্রমোদে এদের দিন কাটত।

ধর্মের গভীরে যে জ্ঞান, ভক্তি, উদারতা ও সার্বজনীন কল্যাণের ভাব নিহিত আছে, সে ভাব উপলব্ধির প্রয়াস লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়ে ধর্মের বহিরঙ্গের কর্মকান্ড এবং বাহ্যাড়ম্বরই হিন্দু সমাজের প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে দুর্গাপুজোয় বলিদান, নন্দোৎসবে কীর্তন, দোলযাত্রায় আবির অর্থাৎ উৎসবাঙ্গন নিয়েই লোকে মত্ত থাকতো। গঙ্গাস্নান, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দান, তীর্থ দর্শন ও অনশন দ্বারা পাপ নাশ হয় এবং পুণ্য অর্জন করা যায়, এটাই স্থির বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছিল। অন্নশুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সমাজে ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাছ-বিচারের অন্ত ছিল না।

ব্রাহ্মণের আধিপত্য যথেষ্ট ছিল। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা কাউকে পাদোদক, কাউকে পদধূলি দিয়ে যথেষ্ট ধনার্জন করতেন এবং কোশাকুশি হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কে কত বড় দাতা, কে কত পুণ্যার্জন করলেন, তার সুখ্যাতি বা অখ্যাতি প্রচার করাই তাঁদের একটা বিশেষ কাজ ছিল।

এই নৈতিক দৈন্য ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন যে সমাজকে বিচলিত করে নি, এটা আশ্চর্যজনক। দু-চারটি ক্ষীণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও মোটের উপর জনসাধারণ এই অবস্থার সঙ্গে একটা রফা করে জীবনের এই ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে নৈরাশ্যবাদের প্রকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু সমাজ জীবনকে পরিবর্তন করে উন্নত করার কোন সুস্থ প্রবল প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের যেন উদ্যম ও উৎসাহ হারিয়ে গিয়েছিল। জড়তায় নিমগ্ন বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়োজন হয়েছিল খৃষ্টান ধর্মযাজকদের আক্রমণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে নবজাগরণের বাণী এনেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর নেতৃত্বে যে মুক্তি আন্দোলন জেগে উঠেছিল,

ক্রমে তার তরঙ্গ এসে লাগে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সমাজে, শিক্ষায়, রাজনৈতিক চেতনায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে মুখ্যতঃ কলকাতা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুদয়ে কলকাতা ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির নিবাসস্থল হওয়ায় এর প্রসিদ্ধি আরো বেড়ে ওঠে। পল্লী থেকে উন্নীত হয় মহানগরীতে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পারমানেণ্ট-সেট্‌ল্‌মেণ্ট অ্যাক্ট দ্বারা জমিদারী প্রথার পত্তন হয় এবং ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে কলকাতা এবং অন্যান্য সহরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। এই সময়ে দলে দলে ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতিও কলকাতায় এসে বাস আরম্ভ করেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম আদমসুমারী অনুসারে কলকাতাবাসীর সংখ্যা নিম্নরূপ ছিলঃ—

হিন্দু	১,২০,৩১৮
মুসলমান	৪৫,০৬৭
ইংরাজ	৩,১৩৮
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৪,৭৬৪
পার্শি	৪০

এ ছাড়া ছিল পর্তুগীজ, চীনা, ইহুদি, জার্মানি ইত্যাদি।

ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বিদেশীদের হাতে থাকায় বহু বিলাতী ব্যবসাদার কলকাতায় ব্যবসা সুরু করে; ফলে নতুন ধরনের দোকান বাজার যেমন নিউ মার্কেট প্রভৃতি গড়ে ওঠে, নতুন ধরনের পণ্যদ্রব্যের আমদানি হয়, যথা বিদেশী সুগন্ধি ও প্রসাধন দ্রব্য, দেখা দেয় কাঁটা-চামচ প্রভৃতির দোকান, ঘোড়ার জুড়ি গাড়ী প্রভৃতি। স্পেনসার অকল্যাণ্ড ইত্যাদি হোটেলের পত্তন হয়, নানা ধরনের ক্লাব গড়ে ওঠে। নানা ধরনের অ্যাসোসিয়েশন সংগঠিত হয়, যথা Horticulture Society, Agriculture Society ইত্যাদি, আবার ঘোড় দৌড়ের প্রচলনও হয়, এক কথায় বিলাতী ধরনের নানা প্রতিষ্ঠান ও পণ্যদ্রব্যের আমদানিতে সহরের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধনীদের নব নির্মিত প্রাসাদের গঠনকৌশলেও বিদেশের প্রভাব লক্ষিত হয় এই সময়।

এই সময়কার যুগান্তকারী আরেকটি অবদান হ'ল মুদ্রাযন্ত্র এবং ছাপাখানার প্রচলন।

কলকাতার উপকণ্ঠে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রবর্তন করে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই সাপ্তাহিকের এক সংখ্যায় হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ধর্মকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় তার যথাযথ উত্তর দেন, কিন্তু সে উত্তর প্রকাশ করা হয় না, তখন তিনি "ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন" নাম দিয়ে একটি পত্রিকা বার করেন। কিন্তু মাত্র তিনটি সংখ্যা বার হবার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ 'বেঙ্গল গেজেট' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক শুরু করেন। বাংলা ভাষায় প্রথমে সচিত্র পুস্তক কবি ভারতচন্দ্ররচিত অন্নদামঙ্গল, ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ছাপান। এ ছাড়া গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, লক্ষ্মীচরিত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থও ইনি প্রকাশিত করেন।

আরো কিছুদিন পর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'সংবাদ কৌমুদী' নামক পত্রিকার সহিত সংশিলষ্ট ছিলেন, পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাস থেকে তাঁর নিজের সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ আরম্ভ করেন। এক দিক্ থেকে তিনি হিন্দু সমাজের সমর্থক ছিলেন, অপরদিকে সমাজের দোষাবলী এবং ধনী সম্প্রদায়ের ত্রুটি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সমাজ সংস্কারের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহরে যারা হঠাৎ ধনী হয়েছেন, তাঁদের ব্যঙ্গ করে, তিনি "নব বাবু বিলাস" ও "নব বিবি বিলাস" নামে দুটি ব্যঙ্গ চিত্র রচনা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরী সঙ্কলিত তাঁর শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বাংলা ভাষায় কথোপকথন ভবানীচরণের প্রকাশিত প্রথম বাংলা গদ্য পুস্তক। এই বইগুলি সহজ কথ্য ভাষায় লেখা হয়।

খৃষ্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মকে কঠোরভাবে আক্রমণের কাজে প্রধানতঃ দুটি অস্ত্র ব্যবহার করে। তার একটি সংবাদপত্র ও ছাপান পুস্তকাদি, দ্বিতীয়টি নানা স্থানে বক্তৃতাদি। কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এই ধর্মযাজকবৃন্দ বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে তাদের আক্রমণের গন্ডীর বাইরে রেখে এসেছে। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের কতগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য হয় তো এর কারণ হতে পারে। তাদের এই সহনশীলতার দ্বিতীয় কারণ যে, নামে মাত্র হলেও ভারতের শাসনভার তখনও মুসলমানদেরই হাতে। বাংলার কোন কোন নবাব পর্তুগীজ রাজশক্তির সহিত যুক্ত পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের কার্যকলাপের প্রতি তাদের তীব্র বিরূপতা প্রদর্শন করেছিলেন।

যদিও ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজকদের চোখে হিন্দু মুসলমান উভয়ই সমানভাবে বিধর্মী, তবু তারা বিশেষভাবে কেবলমাত্র হিন্দু সমাজেরই কুসংস্কারাবলী, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদপ্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথাকে পৃথিবীর সামনে বেশী করে মেলে ধরেছিলেন। ধর্ম ও সমাজের এই অধঃপতন ও দুর্দশার যুগে ব্রাহ্মণ ধর্মের নানা গোঁড়ামি ও বাহ্য আচারের নিপীড়ন থেকে বাঁচবার পথে এই ধর্মযাজকেরা তখন দরিদ্র, তথাকথিত অনুন্নত জাতি ও নারীদের সহায়তা করেছিলেন। ধর্মযাজকদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদে অনেকখানিই সত্য নিহিত ছিল এবং বিশেষতঃ বিদেশীর মুখে এই নিন্দাবাদে সমাজের ভিতরেই সংস্কারপ্রবৃত্তিও সংস্কারকদের জাগিয়ে তোলে।

এইখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা যে দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজকে দেখেছিলেন বা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, তার সবটাই ঠিক সত্যদৃষ্টি নয়। বিধর্মীর আত্মার ত্রাণের বাসনায় তারা একদিকে খৃষ্ট-ধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতার দুর্বলতার কথা না বলে তাকে আদর্শস্থানীয় বলে দেখতে চেষ্টা করতেন, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম প্রকৃত যা তার থেকে তাকে অনেক খর্ব করে দেখেছিলেন। যাই হোক, হিন্দু সভ্যতার গভীরতম বস্তুগুলির সন্ধান না পেলেও, খৃষ্টান ধর্মযাজকবৃন্দ এদেশে আসার ফলে অন্ততঃ খৃষ্টের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করবার চেষ্টায় নিরত থাকতে পেরেছিলেন। ঠিক এই সময়, ইংলন্ড যান্ত্রিক সভ্যতার নতুন অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়ে চলেছিল, যার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মিথ্যা মুখোসের অন্তরালে লোভ, হিংসা, অর্থ-লিপ্সা ও ক্লেশ সমাজজীবনকে কলুষিত করেছিল, সে সমাজ খৃষ্টের আদর্শ থেকে বহু দূরে এবং তার সঙ্গে বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় মগ্ন হিন্দু সমাজের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। অন্যদিকে উপনিষদ্, অর্থশাস্ত্র বা পরবর্তী কালের শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, কবীর যে সব চিন্তাধারা বা বাণীর প্রবর্তন করেছিলেন, তখনকার হিন্দুসমাজে তা লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল।

খৃষ্টান ধর্মযাজকদের বিরোধিতার ফলে হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে কতগুলি নতুন পরিবর্তন আসে। যেহেতু বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন চারদিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা আনতে পেরেছিল এবং এক নতুন ভাবধারার বাহক হিসাবে এসেছিল এবং এই নতুন শাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম খৃষ্টধর্ম ছিল, সেহেতু কিছু লোক শাসকশ্রেণীর ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মিশিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির পথে আসতে পেরেছিল; সে কারণে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, খৃষ্টধর্ম উন্নতির সোপানস্বরূপ এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আদব-কায়দা উন্নতির লক্ষণ। ধর্মান্তরিত করার কাজ ধর্মযাজকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজপুরুষেরা বিশেষভাবে নিরপেক্ষ হয়ে দূরেই থাকতেন। এদের

পূর্বতন মুসলমান শাসকদের ধারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। সে যুগে জোর করে ধর্মান্তরিত করার রীতি ছিল, কিংবা নানারূপ পার্থিব প্রলোভনের দ্বারা ধর্মান্তরিত করাও প্রচলিত ছিল। সে সময় রাজা এবং ধর্মযাজক ধর্মান্তরের কাজে যুক্ত ছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরের কাজ বাংলাদেশে নিপীড়িত জাতিদের মধ্যেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল, উচ্চ বর্ণের এবং সমাজের উপরের স্তরের ব্যক্তিদের বিশেষ স্পর্শ করতে পারল না। কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী (১৮১৩—১৮৮৫) বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের খৃষ্টধর্ম গ্রহণকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। এই শ্রেণীর ধর্মান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্তের অল্পতা থেকে মনে হয় ধর্ম হিসাবে খৃষ্টধর্ম শিক্ষিত বাঙালীর মনে সে সময়ে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

——o——

রামমোহন যুগ

একদিকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত নতুন সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম তথা সমাজের সকল দুর্বলতার কঠিন সমালোচনাপূর্বক তাকে ত্যাজ্য মনে করতে লাগলেন, অপর দিকে যারা এরই আশ্রয়ে রয়ে গেল তারাই হোলো সংখ্যায় অধিক। হিন্দু সমাজ তাদের কাছে শুধু ক্ষয়শীল, দুর্গন্ধময়, কুসংস্কারের আধার নরক-কুন্ড মাত্রই ছিল না। ভবানীচরণের মত নেতারা হিন্দুধর্মের হৃত আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে চেষ্টা করলেন, অতীতের যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যাদি ছিল, তার পুনরুদ্ধারের দ্বারা জনতার উৎসাহ জাগাতে চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সঙ্গে ব্যঙ্গকৌতুকের সাহায্যে জনমত গঠন করে যে জড়তা সমাজকে গ্রাস করেছিল, তার থেকে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই সকল প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও সমাজের অভ্যন্তরে সংস্কারের এবং বাহিরে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনেক কিছু গ্রহণের যোগ্য পথ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই পথে সর্বপ্রথম যিনি সমষ্টিগতভাবে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তিনি রাজা রামমোহন রায়। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর যখন মানুষের চরিত্র গঠনের সময়, তখন রামমোহন হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যা কিছু শ্রেয় তার অধ্যয়নে মগ্ন হয়ে থেকেছেন। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় তিনি সুপন্ডিত ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যের সহিত তার সম্যক পরিচয় ছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের মুক্তিবাদ তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং প্রেরণা দান করেছিল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আসবার অল্পদিন পরেই রামমোহন খৃষ্টান ধর্মযাজকদের নিন্দাবাদ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের চেষ্টায়ও লাগলেন, যার ফলে তাঁকে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল।

ইসলামের একেশ্বরবাদ ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রতি তাঁর গভীর সমর্থন থাকায় এই দুই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিন্দুধর্মের নানা উপাদান গ্রহণ করে তিনি তাঁর নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দুদের রক্ষার উপায় ধর্মত্যাগ বা ধর্মান্তর গ্রহণ নয়, হিন্দুধর্মের গভীরেই রয়েছে তাদের উদ্ধারের পথ।

রামমোহনের দূরদৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়েছিল যে, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতিতে শতধা বিদীর্ণ ভারতীয় জনতার মাঝে যতক্ষণ না ঐক্যবোধ

জাগবে, ততক্ষণ রাজনৈতিক উন্নতি বা সমগ্র জাতির অগ্রগতি সম্ভব হবে না। এই একতাবোধকে কেন্দ্র করেই তাঁর সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা রূপ নেয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আত্মীয় সভা গঠন করেন। ক্রমে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সে সভা Unitarian Committee নাম নেয় এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের যে নব সংস্করণ প্রচার করেন, তা বেদান্ত দর্শনের একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাকার উপাসনা ও যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান বিবর্জিত। তাঁর বিশ্বাস এবং চেষ্টা ছিল যাতে ধর্মীয় অসাম্য দূর হয় এবং অপরের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সহনশীলতার ভাব গড়ে ওঠে। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে বাইবেল পড়ান নিয়ে কলকাতার সারা শিক্ষিত সমাজ যখন আলোড়িত হচ্ছিল, তখন ডফকে সমর্থন করে রামমোহনই প্রথম ঘোষণা করেন যে, বাইবেল পাঠ করলেই যে খৃষ্টান হতে হবে, তার কোন যুক্তি নেই। মুসলমান না হয়েও কোরাণ অধ্যয়ন করা চলে। এই ধর্মগ্রন্থগুলিতে যে সুশিক্ষা বা যা কিছু সদুপদেশ আছে, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেগুলি গ্রহণে কোন হানি নেই। সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্য আনার মানসে তিনি জানুয়ারী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের দ্বার মুক্ত করে দেন।

যদিও রামমোহনই প্রথম ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করে এই ক্ষুদ্র নবগঠিত ধর্মমণ্ডলীকে সযত্নে লালন করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ই (১৮১৭—১৯০৫) ব্রাহ্মসমাজ দেশের মাটিতে তার মূল অনুস্যূত করে হিন্দু সংস্কৃতির রস গ্রহণে পুষ্টি লাভ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও রামমোহনের ন্যায় ইসলামের প্রভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল ভিন্ন, সেখানে সুফী সম্প্রদায়ের কবি মনোভাবের অনেকখানি অবদান ছিল। ব্রাহ্মধর্মের ভিতর তিনি উপনিষদের জ্ঞানের সহিত প্রেম ও ভক্তি ভাবের সমন্বয় করেছিলেন।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম একদিকে যেমন খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছিল, অন্যদিকে তেমনি গোঁড়া সনাতন হিন্দু সমাজকে বিরূপ করেছিল। এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লেখেন যে, রামমোহন রায়ের ধর্মান্দোলন উপস্থিত হ'লে কলকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজা রাধাকান্ত দেবকে তাদের প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে বরণ করেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদে ধর্মসভা গঠিত হয়। রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি ধর্মসভার

বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন। দুই সমাজের মূল লক্ষ্যে সাদৃশ্য থাকলেও সে লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ বিপরীত ছিল।

সহমরণ প্রথা নিবারণের জন্য রাজা রামমোহন রায় বিশেষ চেষ্টা করেন, তাঁর এই প্রয়াসে প্রণোদিত হয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিং-এর বিশেষ যত্নে আইন (Regulation XVII) করে এই নৃশংস প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধর্মসভা এই ব্যাপারে বিশেষ বিরোধিতা করে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সহমরণের স্বপক্ষে বহু যুক্তি দেখিয়ে এই আইন রদ করবার জন্য তৎকালীন সরকারের কাছে আবেদন করা হয় এবং সেই আবেদনের বাংলা ও হিন্দী অনুবাদ জনতার মধ্যে প্রচার করে এই প্রথার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলবার চেষ্টা চলে। ভারতের সমাজ ও ধর্মজীবনে বিদেশী সরকারের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত সে প্রথা যেমনই হোক না কেন, এই ছিল ধর্মসভার মূল বক্তব্য।

রামমোহনের সময় উভয় সভার মধ্যে যত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই থাক না কেন, তার পরবর্তী যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় সেটা মিটে যায়। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্মান্তর করার চেষ্টা দেখে দেবেন্দ্রনাথের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। তিনি এর প্রতিবাদকল্পে সংগঠন কাজে লিপ্ত হন এবং এই কাজে হিন্দু জনসাধারণের যোগ দিতে কোন বাধা থাকে না। তাঁর এই কাজকে সফল করে তোলার মানসে ধর্মসভার সদস্যরা এগিয়ে আসেন, এমন কি রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণও এগিয়ে আসেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের ফলে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্মান্তরের কাজ কিছুটা ব্যাহত হল। এই সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবর্তনের স্রোত বইতে লাগল যা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ, এমন কি কখনও নাস্তিকতার দিকে তার গতি দেখা গেল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার নামে একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী ঘড়ির ব্যবসায়ী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের সহায়তায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ নামে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮২৭—১৮৩১ পর্যন্ত হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক এই কলেজে শিক্ষকতা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাঙালী ছাত্র সমাজের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে সক্ষম হন। নব্য বাংলাকে গড়ে তোলার কাজে ডিরোজিওর নাম অবিস্মরণীয়।

ডিরোজিও সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে লিখেছেন, "ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকৃষ্ট করিলেন"। তিনি স্কুলে ঢোকা মাত্র ছাত্ররা তাঁকে

ঘিরে ধরত। তিনি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ভালবাসতেন। স্কুলের ছুটির পরও তিনি অনেকক্ষণ বসে তাদের পড়াশুনায় সাহায্য করতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর আলোচনার নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজে একপক্ষ অবলম্বন করে কথা বলতেন এবং ছাত্রদের তাঁর বিপরীত পক্ষ নিয়ে আলোচনা করায় উৎসাহিত করতেন। স্বাধীনভাবে তর্ক-বিতর্ক চলতো। তাদের নবীন উৎসুক মনের কাছে অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কেলে, মিল, রীড প্রভৃতির রাজনৈতিক দর্শন ও উদার চিন্তাধারা উপস্থিত করতেন। ছাত্রদের অভিভাবকরা এবং অন্য অনেকে যখন ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, তিনি নিজে নাস্তিক এবং ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকতা প্রচার করেছেন, তখন ডিরোজিও সে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, তিনি নাস্তিকতা প্রচার করেন নি, হিন্দুধর্মের মূলে কোন যুক্তি আছে কিনা তাই বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে তিনি যেমন ছাত্রদের হিউম হার্বার্ট স্পেনসার পড়িয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বার্কলের আস্তিক্যদর্শনও শিখিয়েছেন। যাতে তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয়, যাতে জিজ্ঞাসা ও মৌলিক চিন্তা দিয়ে তারা সত্যের সন্ধান করতে শেখে, যুক্তি দিয়ে, বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমাজের তথা জীবনের বিচিত্র সমস্যাবলীকে দেখে তার সম্মুখীন হতে পারে, এই তাঁর সযত্ন প্রয়াস ছিল। ছাত্রদের মনে তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগাতে পেরেছিলেন। তারা যা কিছু কুসংস্কারপূর্ণ বলে বুঝেছিল, তাকে আন্তরিক ঘৃণা করতে এবং যা কিছু সত্য ও ন্যায় বলে মনে করত, তার জন্য লোকনিন্দা, সামাজিক নির্যাতন প্রভৃতি অন্যান্য নানা দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত ছিল। ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে ছাত্রদের মনে এক বিপ্লব জেগে উঠেছিল, তাদের মধ্যে এক নবীন জীবনের সঞ্চার হয়েছিল, যা নানা দিকে প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর ছাত্রেরা পরবর্তী জীবনে অনেকেই এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের আবেগ বহু বছর পর্যন্ত বঙ্গসমাজকে আন্দোলিত করেছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যাঁরা শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন এবং যেসব কবি ও লেখকদের রচনাবলী পড়ান হ'ত, তাঁদের সকলেরই চিন্তাধারা ফরাসী বিপ্লবজনিত স্বাধীনতার আবেগে অভিষিক্ত ছিল। ঐ শিক্ষকদের কাছে পাঠে রত বঙ্গযুবকদের চিত্তেও সেই আবেগ সঞ্চারিত হয় এবং তাদের মনে নব নব আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভাঙার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য পক্ষপাতিত্বও এই ভাঙার প্রবৃত্তির একটি প্রকাশ মাত্র।

সে সময় শিক্ষিত দলে সুরা পান করা কুসংস্কার ভাঙনের একটি প্রধান উপায়স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম করতে পারতেন, তিনি সংস্কারকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে পরিচিত হতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় বন্ধুদের সঙ্গে টেবিলে বসে ইংরেজী মতে খানা খেতেন এবং পরিমিত মাত্রায় সুরা পান করতেন। তিনি নিজে কখনও মাত্রা অতিক্রম করেন নি। তাঁর অনুকরণে বহু ধনী গৃহে রাত্রে খানা খাওয়া এবং পানের প্রচলন হয়েছিল। রাজা এটা কখনও ভেবে দেখেন নি যে, তাঁর মত দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে সীমা রক্ষা করে চলা সম্ভব হলেও সর্বসাধারণের পক্ষে সে সংযম রক্ষা সম্ভব নাও হতে পারে। এই অসংযত পানের জন্য কতো গুণী-জ্ঞানীর যে সর্বনাশ হয়েছে, তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ডিরোজিও শিষ্য মাধবচন্দ্র মল্লিক কৃষ্ণনগরে ডেপুটি কালেক্টর হয়ে যান। সেখানকার কুসংস্কার নিবারণ ও চরিত্র সংশোধনে উৎসাহী যুবকবৃন্দকে তিনি সর্বরকমে সাহায্য করতেন। এই সম্বন্ধে কার্তিক-চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীতে আছেঃ—

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান্ ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদরপূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব সংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।"

হিন্দু কলেজের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে যে ভাবাবেগ এসেছিল, ক্রমে তা অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ঘরে ঘরে বৃদ্ধদের সঙ্গে বালকদের বিবাদ-কলহ লেগেই থাকতো। অভিভাবকরা এই নিয়ে তাড়না করতেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের বর্ণনায় দেখি, "ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না। অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত। অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ আবৃত্তি করিত।" দেখা যায় যে, রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখলেই তাদের বিরক্ত করবার জন্য "আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো" বলে কেউ কেউ চিৎকার করতো। মুসলমানের

রুটি এবং বাজার থেকে সিদ্ধ করা মাংস এনে খাওয়া যেন সর্বপ্রধান সৎসাহসের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নব্য বাংলার যুবকদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই প্রতীচ্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আজকের দিনে এঁদের অনেক কিছুই বাড়াবাড়ি বলে প্রতীত হতে পারে, কিন্তু সেই যুগে তাঁরা অকপট চিত্তে নিজের নিজের হৃদয়ের আলোক অনুসারে চলার প্রয়াস করেছিলেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। সত্যের প্রতি নবোদিত শ্রদ্ধা সব সময় ধর্ম সংস্কারের খাতে বয় নি, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিপরীতে এমন কি নাস্তিকতার পথেও চলেছে। ধ্বংস-মূলক বিপ্লবের এই বিশ্বাস ছিল যে, চিরাচরিত রীতি-নীতি, প্রাচীন নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তির ভিতর দিয়েই অগ্রগতির নতুন পথের সূচনা হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্মের প্রাণহীন বহিরাবরণ হিন্দু সমাজকে গ্রাস করেছিল, একদিকে ধর্মসংস্কার, অন্য দিকে নব্য যুবকদের ভণ্ডামিমুক্ত সততার প্রতি বিশ্বাস, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এই মৃত্যুর গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করে আত্মার নব নব প্রয়াসের পথ প্রসারিত করেছিল।

বিদ্যাসাগর যুগ

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের পরবর্তী যুগকে বিদ্যাসাগরের যুগ বললে ভুল করা হবে না। অপরিসীম সাহস, নিরপেক্ষতা, তীব্র আত্ম-মর্যাদাবোধ, দেশপ্রেম, সত্য, দয়া প্রভৃতি বহু গুণের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে এক নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন। স্থায়ীভাবে সমাজ সংস্কারের উপায় শিক্ষার বিস্তার, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে বিশেষভাবে যেমন রত ছিলেন, অন্যদিকে হিন্দু বিধবাদের বিশেষতঃ বাল-বিধবাদের ভিত্তিহীন আচার-নিয়মের অজস্র নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কলিযুগে বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত একথা তিনি পরাশর সংহিতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের নজির দেখিয়ে একটি পুস্তিকা রচনার দ্বারা প্রচার করেন। রাধাকান্ত দেবের গৃহে তিনি এ বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হ'ন কিন্তু ধর্মসভার পণ্ডিতদের অথবা যশোহরের হিন্দু রক্ষিণী সভার সদস্যদের এ বিষয়ে নিজমতে আনতে পারেন নি, তাঁরা বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধিতা করেন। ইংরেজী শিক্ষিত একটি ক্ষুদ্র দল এবং বর্ধমানের মহারাজা মহতাপচাঁদ বাহাদুর ছাড়া সকলেই তাঁর এই আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর লেজিস লেটিভ কাউন্সিলে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের জন্য আবেদন জানান। পণ্ডিতেরা তার প্রতিকূল আবেদনও প্রেরণ করেন। ঘোরতর সামাজিক উত্তেজনার মধ্যে ১৯শে জুলাই, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ বিল পাস হয় এবং গভর্নর জেনারেলের অনুমতিক্রমে অ্যাক্ট XV অফ ১৮৫৬ আইনে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হয়।

বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র আইন জারিতেই সন্তুষ্ট হ'ন নি। ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশের সহিত কালীমতি দেবী নামে একটি বিধবার বিবাহ দেন এবং এই বিবাহের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে বহন করেন। পরবর্তী কালে তাঁর নিজের পুত্রেরও একটি বিধবার সহিত বিবাহ হয়।

বিধবা বিবাহ আইন প্রচলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দুদের, বিশেষতঃ কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত বহু বিবাহ প্রথার উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হন। ২৫,০০০টি স্বাক্ষর সহ তিনি এই প্রথার নিবারণের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু সেই সময়টায় সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সরকার

এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু তাতে হতাশ না হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সরকারের কাছে পুনরাবেদনের জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে অনুরোধ জানান। তিনি দেখান যে, বহু বিবাহ মনুস্মৃতির অনুমোদিত নয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে তিনি আরেকটি পুস্তিকা রচনা করেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তিনি দেশবাসীর মধ্যে এ বিষয় সাড়া জাগাতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে থেকে যেমন এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে সে রকম হয় নি। সে সময়কার মুসলমান সমাজ মুখ্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল অভিজাত এবং ধনী সম্প্রদায়, অন্যদিকে ছিল কৃষক, মজুর, শিল্পজীবীদের নিয়ে গঠিত দরিদ্র শ্রেণী।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত একটি বিখ্যাত ফতোয়াতে তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই ফতোয়াতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষ, যা এতদিন "দর-অল-ইসলাম" অথবা ইসলামের রাজ্য ছিল তা আর রইল না, এখন থেকে ভারত "দর-অল-হার্ব" অর্থাৎ শত্রুর রাজ্য হয়ে গেল। খ্রীষ্টান রাজশক্তির কাছে ইসলাম রাজশক্তির পরাভবের গ্লানি অভিজাত সম্প্রদায়ের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, যার ফলে আরব দেশে উদ্ভুত ওয়াহবি আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতীয় মুসলমান সমাজকে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মুজাহিদ্দন বিদ্রোহের রাজনৈতিক সাফল্য অতি সামান্য হলেও অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ জীবনে তার ফল সুদূরপ্রসারী রূপে দেখা দিয়েছিল। খ্রীষ্টান রাজশক্তির হৃতগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজসংস্কারের প্রয়োজন এ বোধ ভারতীয় মুসলমান নেতাদের মনে জাগলেও তাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান সমাজ নিখুঁত, আদর্শ সমাজ, তাতে কোন সংস্কারের স্থান নেই! একমাত্র হিন্দু সমাজের সংস্পর্শদোষ তাকে কলুষিত করেছে, সমাজকে এই সংস্পর্শদোষ মুক্ত করে পবিত্র ইসলাম আদর্শে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই রাজ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব।

দক্ষিণ ভারতে কিছুসংখ্যক মোপলাদের মধ্যে স্থানীয় প্রথানুসারে মাতৃকুলের বংশই সন্তানদের বংশ বলে পরিগণিত হয়। পশ্চিম ভারতে বোরা ও খাজা সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিহারে মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ, নীচ জাতিভেদ বর্তমান। বাংলাদেশেও হিন্দু জাতিভেদের বংশানুক্রমিক জীবিকার ভিত্তিতে নানা বিভেদ বর্তমান ছিল। এমন কি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও হিন্দু সমাজের অনুরূপ উচ্চ,

নীচ, ছুৎ, অছুতের বিচার প্রচলিত ছিল। মুসলমানের পালপার্বণে হিন্দুদের যোগদান এবং হিন্দু উৎসবে মুসলমানদের অংশ গ্রহণও বিরল ছিল না। বিশেষতঃ সুফীবাদের প্রভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী ভেদের গতি ক্রমশঃ অপরিসর হয়ে এসেছিল।

ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলমান নেতারা অনুভব করলেন যে, যদি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে এক ইসলামের পতাকা তলে একীভূত হতে হয়, তাহলে বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে এই যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য এটা দূর করতে হবে। হিন্দু সংস্পর্শ বর্জিত একত্রিত মুসলমান সম্প্রদায় খৃষ্টান রাজশক্তির মোকাবিলায় সক্ষম হতে পারে এই চিন্তা নেতাদের মনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিল।

বাংলার তৎকালীন অভিজাত মুসলমান শ্রেণীর মাঝে নেতার বিশেষ অভাব থাকায় ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্যও বাংলার অভিজাত সম্প্রদায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপরই নির্ভর করতে আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের ফলে তাদের মধ্যে উর্দু শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। উর্দু যাতে বিশুদ্ধ হয় এবং কোনমতে বাংলা ভাষার দ্বারা প্রভাবিত না হয়, সেজন্য ছেলেদের লক্ষ্ণৌ এবং আলিগড়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাবার প্রচলন হয় এবং অভিজাত গৃহে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়।

অধিকাংশ নগরবাসী হিন্দুদের মধ্যে যখন কলকাতা, বম্বে বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে ব্যগ্র, তখন মুসলমান যুবকবৃন্দ সে শিক্ষাকে বিজেতাদের শিক্ষা জ্ঞানে ঘৃণার সহিত বর্জন করে চলেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রাস, ফার্স্ট আর্টস্ ও বি-এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র সংখ্যার বৈষম্য এই চিত্রকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যেখানে ১৮২৩ জন হিন্দু ছাত্র বসেন, সেখানে মুসলমান পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৩ জন। ফার্স্ট আর্টসেও ৩৭৩ জন হিন্দু ও ৯ জন মুসলমান ছাত্র পরীক্ষা দেন এবং বি-এ পরীক্ষায় ১৫৭ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমান বসেন।

শিক্ষিত হিন্দু সমাজ যখন ক্রমশঃ ধর্মনিরপেক্ষতার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে, ধর্মবিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে সুসংস্কৃত করে নব যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে, মুসলমান সম্প্রদায় তখন সংস্পর্শ দোষ বর্জন করে ইসলামের আদর্শে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করেছে, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী বিভেদ গভীরতর হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা মুসলমান সমাজের কেবলমাত্র বাহ্য জীবনের পার্থিব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল,

তার প্রভাব তাদের সমাজ বা সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে বা স্পর্শ করতে পারে নি।

বাংলার দরিদ্র গ্রামবাসী মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এই সময় শিক্ষার প্রতি একটা আগ্রহ দেখা যায়। প্রচলিত গল্প, কাহিনীকে উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে মুদ্রিত করার প্রয়াস চোখে পড়ে। এর জন্য এক ধরনের উর্দু-ঘেঁষা মুসলমানী বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হত।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পথ নির্ধারণে সে সময়কার রাজনৈতিক পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক ও শিল্প বিজ্ঞানের পরিবর্তন যে কি পরিমাণ দায়ী, তার গুরুত্ব আমরা অনেক সময় ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। এর বহু নিদর্শন পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"য়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার সমাজ জীবন ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যে প্রগতিবাদের আধিপত্য দেখা যায়, তার পিছনে পূর্বগামীদের শিক্ষার ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে কতখানি প্রচেষ্টা যে নিহিত রয়েছে, তার যথাযথ মূল্য অনেক সময়ই ঐতিহাসিকেরা দেন না।

যদি শিল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোন একটি নূতন আবিষ্কার বা প্রচলনের কথা বলতে হয় যা সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তাহলে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের কথা বলতে হয়।

N. B. Halhad ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ১৭৯১-৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারের সুবিধার জন্য অনেকগুলি নিয়মাবলী বাংলা ভাষায় ছাপান হয় এবং ১৭৯৩-৯৭-এর মধ্যে বাংলা শব্দ সমষ্টি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের এই প্রথম সূচনা। সে সময়কার আদান-প্রদানের প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত বা ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ভাষার ব্যবহারও সেই প্রথম শুরু হয়।

N. B. Halhad এবং Henry Pitts Foster ১৭৭৮ থেকে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে আরবী ও ফারসী শব্দের বাহুল্য থেকে মুক্ত করে তার পরিবর্তে সংস্কৃতমূলক সহজ বাংলা শব্দ ব্যবহারের বিশেষ চেষ্টা করেন।

ইংরেজ মনীষীরাই মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত বা শকুন্তলার মত সংস্কৃত গ্রন্থকে প্রথম অনুবাদ করেন, যার ফলে বিশ্বজনের কাছে এক নতুন লোকের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা ইংরেজের কাছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। দেখা যায়

বাংলার তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় নবোদিত বাংলা গদ্য সাহিত্য এবং মুদ্রাযন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাবার বিভিন্ন চেষ্টা করেছেন। যে সকল শাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি এতদিন শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের আয়ত্তে ছিল, তাকে অনুবাদ করে বৃহত্তর জনতার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

এই সময়কার আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল প্রগতিশীল বা প্রাচীনপন্থী নির্বিশেষে শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে এদেশে বিদ্যাচর্চার জন্য সরকারী তহবিলে এক লক্ষ করে টাকা জমা হচ্ছিল। তখনকার লেফ্‌ট্‌নেণ্ট গভর্ণর এবং তাঁর পার্ষদরা এই অর্থে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হবে স্থির করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন নামে একটি কমিটি স্থাপিত হয়। এই কমিটির উপর কলেজ স্থাপনার ভার পড়ে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় আসেন এবং তখন থেকেই এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি যখন দেখলেন শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য শিক্ষার উৎসাহ দানে ব্যয় হতে চলেছে, তখন তার প্রতিবাদ করে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে এক চিঠি লেখেন। চিঠির মর্মার্থ নিম্নরূপঃ—

সরকার বাহাদুরের কলকাতায় নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনা করে শিক্ষার উন্নতি করার প্রয়াস প্রশংসনীয় এবং ভারতবাসীর সেজন্য চিরকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মানবহিতৈষী মাত্রেরই কাম্য যে, এই উন্নীত প্রচেষ্টা এমনভাবে পরিচালিত হয়, যার দ্বারা দেশের বুদ্ধিবৃত্তি-কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে সার্থকতা লাভ করতে পারে। যখন বিদ্যায়তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন আমরা ভেবেছিলাম ইংরাজ সরকার ভারতবাসীদের শিক্ষায় ব্যয়ের জন্য প্রতি বছর যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের মন আশায় ও আশ্বাসে ভরে উঠেছিল যে অংকশাস্ত্র, দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সব শাস্ত্রে উৎকর্ষ লাভ করে ইয়োরোপের অধিবাসীরা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে আজ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন, ভারতবাসীদেরও সেই সকল বিদ্যাদানের জন্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষিত, ইংরাজ ভদ্রলোকদের নিয়োগে এই অর্থ ব্যয় হবে।

আমরা দেখছি এ দেশে যে বিদ্যার চর্চা প্রচলিত আছে, সেই প্রচলিত জ্ঞান বিতরণের জন্য হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে সরকার বাহাদুর একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনা করতে চলেছেন। সেই শিক্ষায়তন (লর্ড বেকনের পূর্বে ইয়োরোপে যেরূপ ছিল সেইরূপ) কেবলমাত্র ব্যাকরণ ও দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার

দিয়ে যুবকদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা ছাড়া শিক্ষার্থীদের বাস্তবিক কোন প্রয়োজনে লাগবে না।

দু'হাজার বছরের পুরনো জ্ঞানের সঙ্গে কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিদের কিছু কিছু শূন্য গর্ভ সূক্ষ্ম বিচার যোগ করে যে বিদ্যা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে যার প্রচলন আগে থেকেই আছে, ছাত্রদের মাত্র তাই শিক্ষা দেওয়া হবে।

ভারতবাসী প্রজাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ সরকার নির্দিষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে যদি সেটা ব্যয় করা হয়, তাহলে সরকারের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে, কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূক্ষ্ম বিচার শিক্ষায় জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান্ সময়ের বার বছর অতিবাহিত করে যুবকরা যে বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করতে পারবে এ আশা বৃথা।

ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র, বিশ্বের বস্তুপুঞ্জকে আদর্শ ভাগে ভাগ করা যায় জেনে, কিংবা, আত্মার সহিত দেহের সম্পর্ক কিরূপ, অথবা চোখের সঙ্গে কানের কি সম্বন্ধ এ বিষয় জ্ঞান লাভ করে যে মানসিক উন্নতি লাভ করবে এটা বলা চলে না।

মহামান্য গভর্ণর যাতে এই কাল্পনিক শিক্ষার মূল্য ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তার জন্য তাঁকে ইয়োরোপে লর্ড বেকনের পূর্বেই বা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল এবং পরবর্তী যুগেই বা তার কি রকম অগ্রগতি হয়েছে তা স্মরণ করতে বলি।

যদি ব্রিটিশ জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে অজ্ঞানতামূলক যে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ছিল তা অপসারণ করে তার পরিবর্তে বেকনের দর্শন শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা হত না, সেইরূপ ভারতবাসীকে অন্ধকারে নিমগ্ন রাখাই যদি ব্রিটিশ আইনসভার উদ্দেশ্য হত, তাহলে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতিই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যখন ভারতবাসীর উন্নতিই সরকারের উদ্দেশ্য তখন উন্নত, উদার, শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের প্রয়োজন যাতে নির্দিষ্ট অর্থে অঙ্ক, রসায়ন, অস্থিবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন্য ইয়োরোপের শিক্ষিত মনীষিদের শিক্ষকতায় নিয়োগ করা হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদিতে সজ্জিত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা রামমোহনের পত্রে তাঁর প্রগতিশীল দেশবাসীর মনোভাব ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তাঁরা দেখেছিলেন ইয়োরোপের প্রকৃত মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সাধনায়। যে জ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করে ইংলণ্ড শক্তিমান্ হতে পেরেছিল, সেই জ্ঞানলাভের জন্য বাংলাদেশে বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দকে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল বলা যেতে পারে। একদিকে প্রাচ্যপন্থীরা বৃত্তি দিয়ে, প্রাচীন আরবী ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করে, দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদের নিয়োগ করে, সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসাতে ছাত্র আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তার জন্য আন্দোলন চলতে লাগল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলেকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা সম্পর্কীয় আইন অনুসারে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা সম্ভব কিনা পরীক্ষা করতে দেওয়া হল। পরীক্ষান্তে তিনি মত দিলেন যে, উক্ত বা অনুক্ত এমন কোনও বাধ্য বাধকতা নেই, যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ কোন বিশেষভাবে ব্যয় করতে হবে। যে জ্ঞান বাস্তবিক আহরণের যোগ্য সেই জ্ঞান বিতরণেই ওই অর্থ ব্যয় করা উচিত। সংস্কৃত অথবা আরবী অপেক্ষা ইংরেজী যখন অধিক শিক্ষণীয় এবং এ দেশবাসীর ইচ্ছা যখন অনুরূপ এবং তাদের পক্ষে ইংরেজীতে পাণ্ডিত্যলাভ করা যখন সম্ভব, তখন সেই চেষ্টাই করা উচিত। তিনি আরো বলেনঃ—

"আমার সংস্কৃত কিম্বা আরবীর জ্ঞান নেই তবে এই দুই ভাষায় লিখিত গ্রন্থে কি আছে তার সঠিক মূল্য নিরূপণের জন্য যা করা সম্ভব আমি করেছি। এ দেশে এবং স্বদেশে প্রাচ্য ভাষায় যাঁরা সুপণ্ডিত তাঁদের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। প্রাচ্য শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাচ্যবাসীদেরই মূল্য স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত। এক সেল্ফ ইয়োরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে, সমগ্র ভারতীয় বা আরবী সাহিত্যে তা নাই একথাকে অস্বীকার করতে পারেন এমন একজনকেও আমি পাই নি।"

সেই সময় শিক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে রাজপুরুষদের এবং দেশের বড় লোকদের মধ্যে দুটি দল গড়ে উঠেছিল। একদলের মতে প্রাচীন যা কিছু সবই ভাল এবং সে সবই রাখতে হবে। অন্য দলের মতে যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু প্রাচ্য সবই মন্দ তাকে যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে এবং যা কিছু পাশ্চাত্ত্য সবই ভাল। মেকলের মতদামের পর দুই দলের বিভেদ গভীরতর হয়েছিল।

রামমোহন রায় ভালভাবে জানতেন হিন্দু জাতির মহত্ত্ব কোথায় এবং তাকে সযত্নে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন অথচ তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য নীতি এবং পাশ্চাত্ত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয়, গ্রহণীয় মনে করেছিলেন। নবীনকে বরণ করতে গিয়ে তিনি প্রাচীনকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। নব্য বাংলার যুবকবৃন্দ সব সময় এই ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি! ডিরোজিওর শিষ্য এবং মেকলের অনুসরণকারীরা কি রকম উগ্র পাশ্চাত্যপন্থী

ছিলেন তার কিছু কিছু নিদর্শন আগেই দেওয়া হয়েছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতি স্থাপনা দ্বারা এই প্রতীচ্যমুখী শিক্ষার ধারাকে প্রাচ্যমুখী করবার চেষ্টা করেন। তিনি দেশের সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলের মধ্যে সমন্বয় আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশে সেই সময় আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায় এবং সে আগ্রহ শুধুমাত্র 'প্রগতিশীল' বা 'পাশ্চাত্যপন্থী'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরবর্তী যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল নেতাদের মধ্যেও প্রকাশ পায়।

মাসিক পত্রিকা ও পুস্তিকাদির ভেতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সাধারণ জ্ঞানকে সার্বজনীন করবার একটা চেষ্টা চোখে পড়ে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রথম বাংলা পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ করে এবং তাতে বাষ্পচালিত জাহাজ, বেলুন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বর্ণনা স্থান পায়। রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "পশ্বাবলী" নামে এক সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করে তার প্রতিসংখ্যায় সিংহ, ভালুক, গণ্ডার, জলহস্তী ইত্যাদি বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের সচিত্র বিবরণ থাকতো।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে 'পক্ষীর বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বার বছর পর্যন্ত অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাতে প্রকাশিত সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। আরো পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর "বিবিধার্থ সংগ্রহ"র (১৮৫১) মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়কে এমন কি প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসকেও জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেছেন।

সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রগতিশীল নেতা যখন নানা সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীকে মুক্ত করে সমাজজীবনে তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, তখন সংরক্ষণশীল দলের নেতা এবং স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক রাধাকান্ত দেব নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এগিয়ে এসেছেন। স্কুল বুক সোসাইটির অধীনে যে পাঠশালাগুলি ছিল, তাতে বালকদের সঙ্গে বালিকাদেরও শিক্ষা দেওয়া স্থির হয় কিন্তু সোসাইটির অন্যান্য সভ্যরা বিশেষ আপত্তি করায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" নামে একটি

খ্রীষ্টান মিশনারী প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনা করে তখনও রাধাকান্ত দেব এই চেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এমন কি তাঁর স্বরচিত "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" নামে পুস্তক তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাবার জন্য দেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ড্রিংকওয়াটার বীটন বা বেথুন যখন প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন, তখন রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতারা সক্রিয়ভাবে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন।

সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার সহজ ছিল না, কারণ তখনকার সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে বিপরীত মনোভাব ছিল। বিখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেন এবং তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিদ্যালয়েই হোক অথবা নিজের গৃহেই হোক স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার এক বিশেষ সমস্যা ছিল। তাই বিদ্যালয় স্থাপনা ছাড়াও নেতারা অন্য উপায়ের কথাও চিন্তা করেছিলেন। কেবশচন্দ্র সেন একটি শিক্ষায়তন স্থাপনা করেন, যেখানে মহিলাদের শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিদ্যা শেখান হয়। উদ্দেশ্য ছিল যে, এখানে শিক্ষালাভের পর শিক্ষয়িত্রীরা বিভিন্ন গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শিক্ষা-দানের কার্য করতে পারবেন। সে যুগে প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, দ্বিতীয়ত কুমারীদের অবরোধের বাইরে আসার প্রচলন ছিল না, তাই এই শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য কুমারী পাওয়া সহজ নয় জেনে গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রস্তাব করেন যে মধ্যবয়স্কা বিধবাদের এই শিক্ষার কাজে নিয়োগ করা হোক।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গা-মোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও কেশবচন্দ্র সেন স্থাপিত 'ভারত আশ্রমে' নারীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হোক এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মনোমোহন ঘোষ ও মিস্ অ্যাক্রয়েড়ের সহযোগিতায় দুর্গা-মোহন দাস কলকাতায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা সম্পর্কে প্যারীচরণ সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় লেখা পড়া অঙ্ক ও নানা কার্যকরী বিদ্যা শিখিয়ে বালিকাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্যারীচরণ বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। চোরবাগান অঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর বালিকাদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন।

অবহেলিত অবস্থায় থেকেও বাংলার মেয়েরা কি ভাবে জাতীয় কৃষ্টি নিজের অজ্ঞাতসারেও রক্ষা করে চলেছিলেন, অজ্ঞানতার মধ্যে থেকেও কি ভাবে ধৈর্য, বীর্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে চলেছিলেন, তার বহু পরিচয় আমরা পাই

রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, সারদা দেবী প্রমুখ মহীয়সী নারীদের জীবনে।

উত্তর বাংলার রাজসাহী জেলার ছাতিম গ্রামে আত্মারাম চৌধুরী ও কস্তুরী দেবীর একমাত্র সন্তান ছিলেন ভবানী। সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রচলন ছিল না। ধনীর কন্যা হওয়ায় গৃহেই কিছু বাংলা এবং কিছু সংস্কৃত শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা ভারতীয় নারীর আদর্শকে তিনি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। অতি শৈশব থেকেই তিনি দেখেছিলেন কি ভাবে তাঁর মা আত্মীয়পরিজন ছোট-বড় নির্বিশেষে হাসিমুখে সকলের সেবায় নিজেকে পরিপূর্ণরূপে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে তিনি শিখেছিলেন কর্তৃত্বাভিমান, আত্মসুখ এবং রাগ-দ্বেষ সর্বথা বর্জনীয়।

নাটোরের রামজীবনের পোষ্যপুত্র রামকান্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে তাঁদের মিলিত জীবন এগিয়ে চলে। মাঝে এক সময় আত্মীয়ের চক্রান্তে রামকান্ত রাজ্যহারা হয়ে বিশেষ দারিদ্র্য ও দুঃখে পড়েন, সে সময় ভবানী হাসিমুখে সব দুঃখ বরণ করে নিয়ে স্বামীর পাশে থেকে তাঁকে উৎসাহ, শক্তি, সান্ত্বনা ও সাহস যোগান। পরে রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি বিধবা হন। তখন থেকে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সহিত তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন।

যে ধন দুঃস্থের প্রয়োজনে লাগে না, তা ধনই নয় এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। শিক্ষার প্রসার ও অধ্যাপনার জন্য তাঁর তহবিল থেকে বাৎসরিক ২৫ হাজার টাকা বৃত্তির জন্য বরাদ্দ ছিল। টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপনা করে তিনি শিক্ষার্থীদের বিদ্যা ও অন্নদান করতেন। সে যুগে হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় না থাকায় তিনি বেতন দিয়ে ৮ জন বৈদ্যকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের উপর নির্দেশ যাতে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগীর চিকিৎসা করেন এবং বিনা পয়সায় তাদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন।

বহু ভূমিহীন দরিদ্রকে তিনি নিষ্কর ভূমিদান করেন, যার আয়তন সবশুদ্ধ ৫ লক্ষ বিঘা। সাধু-সন্ন্যাসী সংসারত্যাগীদের বহু বৃত্তি তিনি দিতেন।

নবাব সিরাজদৌল্লার সহিত তাঁর ব্যক্তিগত কারণে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও যখন রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, সিরাজদৌল্লার বিপক্ষের বহু অনুনয় সত্ত্বেও তিনি মিরজাফরের দলে যোগদান করেন নি।

২৪-পরগণার হালিসহরের কাছাকাছি কোণা গ্রামে হরেকৃষ্ণ নামে দরিদ্র কৈবর্তের গৃহে রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন (১৭৯০-১৮৬১)। হরেকৃষ্ণ চাষবাস ও ঘরামীর কাজ করে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করতেন। তিনি সামান্য

বাংলা জানতেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় নিষ্ঠার সহিত রামায়ণ পাঠ করতেন। রাসমণি শৈশব থেকে অতি আগ্রহের সঙ্গে এই পাঠ শুনতেন এবং এই রামায়ণ মহাভারতের ভেতর থেকেই তিনি জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

দশ বছর বয়সে জানবাজারের জমিদার প্রীতরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্রের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। নারীর বিদ্যাশিক্ষা সে যুগে বিশেষ দূষণীয় ছিল, তাই রাজচন্দ্র গোপনে রাসমণিকে বাংলা লেখাপড়া শেখান। রাজচন্দ্র সদালাপী, উদারপন্থী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং সহমরণ প্রথা রোধে লর্ড বেণ্টিঙ্ককে তিনি বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষার জন্য যখন হিন্দু কলেজ স্থাপনা হয়, তখন তিনি বহু অর্থ দান করেন এবং দশজন ছাত্রের পাঠের সমস্ত ব্যয় বহন করবার ভার নেন। তাঁর মৃত্যুর পরও রাসমণি চিরদিন এই কর্তব্য পালন করে গেছেন।

রাসমণির চরিত্রে যেমন একদিকে দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্মপ্রাণতা দেখা যায় অন্য দিকে তেমনি ছিল তাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তা। তাঁর করুণাপ্রবণ হৃদয় দুস্থের দুঃখমোচনে এবং জনহিতকর কাজে সদা উৎসুক ছিল। তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিবাহের অল্প দিন পরেই তাঁর বিশেষ অনুরোধে জানবাজারের রাজা গঙ্গাস্নানের অসুবিধা দূর করার মানসে বাবুঘাট স্থাপনা করেন এবং জানবাজার থেকে ঘাট পর্যন্ত রাস্তা বাঁধিয়ে দেন। এই রাস্তা পরবর্তী কালে কর্পোরেশন ষ্ট্রীট নামে সুপরিচিত হয়। নিমতলার শ্মশানঘাট, আহিরীটোলার স্নানঘাট এবং চাঁদনীও এঁরই অবদান।

মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং বিস্তীর্ণ জমিদারী রেখে যান। অন্তঃপুরবাসিনী রাসমণি তাঁর জামাতাদের সাহায্যে বিশেষ দক্ষতার সহিত এই সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও জমিদারী পরিচালনা করেন।

দারিদ্র্যের উৎপীড়ন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অর্থ এবং সামর্থ্য দিয়ে তিনি যথাসাধ্য তার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করতেন। একবার জল-পুলিশ গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য এক নতুন কর ধার্য করে, যার ফলে দরিদ্র জেলেরা বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। এই কর রদ করার জন্য প্রথম তারা সরকারের কাছে আবেদন করে। তাতে কোন ফল না পেয়ে কলকাতার বিত্তশালী অনেকের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করে, তাতেও বিফল হয়ে রাণী রাসমণির কাছে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানায়। তিনি তাদের অভয়দান করে বাৎসরিক দশ হাজার টাকা ব্যয়ে কাশীপুর থেকে মেটিয়াবুরুজ

পর্যন্ত গঙ্গার সমস্ত অংশ জমা নেন এবং তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দেন, তাঁর জমা নেওয়া অংশের দুই দিকে গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বয়া দিয়ে জাহাজ বা নৌকা চলাচলের পথ বন্ধ করে দিতে। জলপুলিশ তাঁর এই কাজের কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বলেন যে, তিনি অনেক টাকা খাজনা দিয়ে গঙ্গার এই অংশ জমা নিয়েছেন। স্টীমার বা নৌকা যাতায়াত করলে মাছ পালিয়ে যায়, তাতে মাছ ধরার অসুবিধা হয়। তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। জলপুলিশ রাসমণির নামে মোকদ্দমা সুরু করে। তিনি একদিকে ভাল উকিল-ব্যারিস্টার রেখে মোকদ্দমা চালিয়ে যান, অন্য দিকে জলকর তুলে নেবার জন্য সরকারকে আবেদন করেন। মোকদ্দমায় তিনি জয়ী হন এবং সরকারের আদেশে জলকর প্রত্যাহার করা হয়।

আর এক বার তাঁর মকীমপুরের জমিদারীর প্রজাদের উপর নীলকর সাহেবের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। জানতে পেরে রাসমণি দুর্জয় সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সুশিক্ষিত পাইক দিয়ে নীলকর সাহেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। সাহেব রাসমণির বিরুদ্ধে নালিশ করে মোকদ্দমা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই ধরণের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রাসমণির জীবনে পাওয়া যায়।

তাঁর দান-দাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না। জানবাজারের বিখ্যাত রূপোর রথ তাঁরই দান। বিলেতী দোকানে বায়না দিলে রথের কারুকার্য ভাল হবে এবং সময় মত পাওয়া যাবে এই বলে রাণীর জামাইরা বিলেতী দোকানে রথ তৈরী করতে দিতে চান। রাণী তাতে দৃঢ়তার সহিত আপত্তি জানিয়ে লক্ষ টাকা ব্যয় করে দেশী কারিগর দিয়ে রথ প্রস্তুত করেন, তাঁর যুক্তি ছিল যে, দেশের স্বর্ণকাররা এই অর্থে লাভবান্ হোক। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির তাঁর অন্যতম কীর্তি।

একবার তিনি তীর্থদর্শনে কাশী যাবেন, তার ব্যবস্থা শেষ, এমন সময় দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। কাশীযাত্রা স্থগিত করে রাসমণি বলেন, "অন্নহীনকে অন্ন না দিয়ে কাশী গেলে অন্নপূর্ণা হবেন বিরূপ, কালভৈরব দেবেন তাড়িয়ে"। জামাইদের ডেকে বলেন যে, কাশী যাওয়া হবে না, অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের নামে যাতে দুর্ভিক্ষ রোধ করা যায়, তাই করতে হবে, অর্থের জন্য কোন চিন্তা না করে।

হুগলী জেলার জয়রামবাটীতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা দেবীর জন্ম হয়। সরলা পল্লীবালা সারদা দেবীর লেখা-পড়া বিশেষ হয় নি বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণের শিক্ষায় এবং আপন সাধনায় যে বিদ্যা শিখলে

জগতে অবিদ্যার ভয় থাকে না—তা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল গভীর এবং দৃষ্টি ছিল অন্তর্নিহিত।

একবার তাঁর মনোবল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পরমহংস দেব তাঁকে ডেকে বলেন যে, তাঁর এক মাড়োয়ারী ভক্ত তাঁকে দশ হাজার টাকা দিতে চায়, তিনি নেবেন না শুনে সারদা দেবীকে সেই টাকা দিতে চাইছে, তিনি কি নিতে রাজী আছেন? সারদা দেবী বলেনঃ "তা কি হয়, আমি নিলেও তো তোমারই নেওয়া হবে। তুমি মহাত্যাগী সেই জন্য লোকে তোমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। টাকা নিয়ে কি হবে, ও সব আমাদের চাই না।"

রামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর ৩৪ বৎসর পর্যন্ত তিনি অসংখ্য ভক্তকে তাঁর করুণাধারায় অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর কাছে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই সমান ছিল। পতিতাকেও তিনি কৃপা করতেন, বলতেন, "পাপ করে যার অনুতাপ আসে, তার পাপ থাকে না, ঠাকুর তাকে কৃপা করেন"।

এ তো গেল ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ না পেয়েও যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেই সব মহীয়সী নারীর কথা।

সামান্য সুযোগ পেয়ে সে যুগের বাঙালী মহিলারা শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সমাজ ও দেশ সেবার ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এই সম্পর্কে আমরা স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, কামিনী রায়, সরলা দেবী, তরু দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগে স্কুল-কলেজে যাবার অবকাশ তাঁর হয় নি, তবে গৃহের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংগীত চর্চার পরিবেশের মাঝে পিতার কাছে তিনি যথেষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং বিবাহের পর তিনি ইংরেজী শিক্ষালাভ করে ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী যে কেবলমাত্র সুলেখিকা হিসাবে পরিচিত তাই নয়, বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে তিনি বহুদিন পর্যন্ত ভারতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এ ছাড়া সমাজসেবা এবং নারীমুক্তি আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারীকল্যাণ উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'সখী সমিতি'র প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে এই সমিতির সেক্রেটারীর পদে বহুদিন পর্যন্ত কাজ করেন। নিরুপায় বিধবা এবং বালিকাদের শিক্ষাদানে স্বাবলম্বী করে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

মধ্যবয়স্কা মহিলারা শিক্ষালাভের পর যাতে অন্তঃপুর-বাসিনীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন এ চেষ্টা তো ছিলই, তা ছাড়া শিক্ষার্থিনীদের নানারূপ হাতের কাজও শেখান হত এবং আনন্দমেলা করে তাদের তৈরী হাতের কাজের প্রদর্শনী এবং তাতে কিছু কিছু তৈরী জিনিস বিক্রিও করা হত।

স্বর্ণকুমারী দেবী একজন বিশেষ দেশপ্রেমী ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আরো কয়েকটি মহিলার সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসসভায় যোগদান করেছিলেন। যে কালে নারীকে বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে দূরে অবরোধের অন্তরালে রাখার রীতি ছিল, সে যুগে এই প্রকাশ্য যোগদানের মূল্য সামান্য নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট এবং প্রথম নারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি 'বেথুন কলেজে' শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি 'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ' থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলেতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা লাভ করে ফিরে আসেন।

জাতীয় কংগ্রেস সভায় ইনিই বাংলার প্রথম মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। স্বর্ণকুমারী দেবীর মত ইনিও দেশ এবং সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী রায় কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় অঙ্কে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করে 'লীলাবতী' উপাধি পান, তারপর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রিয়ংবদা দেবী, সরলা দেবী প্রমুখ কিছু কিছু মহিলা সে যুগে গৃহের বাইরে শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হয় এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি, বাচস্পত্য অভিধান নামে আরো দুটি অভিধান, তা ছাড়া, শ্রীমদ্ভাগবত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশী-রাম দাসের মহাভারত, আনন্দলহরী, মনু ও যাজ্ঞবল্কের মিতাক্ষরা ও

দায়ভাগ পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানের ব্যাখ্যা ও তার বঙ্গানুবাদ বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজী শিক্ষার সহজ উপায় ইত্যাদি এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৮২২, ১৮২৬ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখলে সে সময়কার সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের রুচির সম্বন্ধে এবং কি ধরণের লেখার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল তার একটা ধারণা জন্মায়।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে দেখা যায় সংস্কৃত রামায়ণ এবং তার ইংরেজী অনুবাদ, অমরকোষ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং সাংখ্যসার। বাংলা বইয়ের ভেতর চোখে পড়ে কেরী রচিত ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ প্রভৃতি গল্প ও কাহিনী। রাজাবলী (ইতিহাস), গোলাধ্যায় (ভূগোল), দিগ্‌দর্শন, গুরু দক্ষিণা, বিল্বমঙ্গল, কর্মলোচন (সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ) এবং কানাড়া, পাঞ্জাবী, তেলেগু ও বর্মী ভাষায় ব্যাকরণ।

এ ছাড়া তিমির নাশক প্রেস, হারাণচন্দ্র রায়ের প্রেস, মিষ্টার পিয়ারের প্রেস, পীতাম্বর সেনের প্রেস, বারাণসী আচার্যের প্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রেস থেকে বিচিত্র ধরনের পুস্তকাবলী প্রকাশিত হয়, আর কিছু ধর্ম পুস্তক, যথা, বাংলায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী, শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর, শিব-মহিম্নঃ স্তোত্র, কালীর সহস্রনাম, বিষ্ণুর সহস্রনাম, রাধার সহস্রনাম, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি, কিছু কিছু বা হিতোপদেশ, নলদময়ন্তী, বিদ্যাসুন্দর, চৌরপঞ্চাশিকা প্রভৃতি গল্প, কাব্য বা উপন্যাস, কিছু দায়ভাগের অনুবাদ, নীল আইনের অনুবাদ, ব্যবস্থার্ণব প্রভৃতি আইনের পুস্তক, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক, চাণক্যশ্লোক, নিত্যকর্মপদ্ধতি, পঞ্জিকাদি নানা ধরণের গ্রন্থ দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের গ্রন্থাকারে নিবন্ধ চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চিরাচরিত ধারা এবং প্রাচীন সাহিত্যের যথেষ্ট প্রাধান্য বিদ্যমান।

দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার পর শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বাংলাদেশে শিক্ষিতদের জন্য অর্থোপার্জনের বিভিন্ন পথের উদ্ভব হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনার সহিত দেশের সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলেরই নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশের এবং প্রসারের সুযোগ আসে। মিশনারী অথবা সহানুভূতিশীল ইয়োরোপীয় প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং সরকারী ও বেসরকারী নেতৃবৃন্দের প্রয়াসে গঠিত জনমতের প্রভাবে সারা দেশে যে পরিবর্তনের প্রবাহ আসে তা সমাজ বা ধর্মসংস্কারকদের কল্পনাকে বহুদূর অতিক্রম করে যায়।

এই পরিবর্তনের একটি ফল এই দাঁড়ায় যে গ্রাম এবং শহরের জীবনে এবং স্বার্থে যে ভেদ ছিল তা গভীরতর হয়ে ওঠে।* গ্রামের নেতৃস্থানীয়রা ক্রমশঃ গ্রাম পরিত্যাগ করে ক্রমবর্ধমান নগরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন। দেশের মূলধন ও সম্পদ্ জমিদার শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। জাতি, বর্ণ, নির্বিশেষে এক শিক্ষিত, প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজের হাতে চলে যায়। ভারতীয়দের হাতে কদাচিৎ যা থেকে যায়, তা বৃটিশ শক্তির আওতায় দেশে বৃটিশ উদ্যোগের উপায়স্বরূপ হয়েই থাকে। জীবিকা নির্বাহের পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে দেখে, সমাজে নিজেদের প্রাধান্য সম্পর্কে সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে সারা শতাব্দী জুড়ে দেশের নানা স্থানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ছোট ছোট বিদ্রোহ জেগে ওঠে। এই বিদ্রোহ কখনও চাষীদের মধ্যে, কখনও পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে, কখনও বা নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কখনও বা সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ১৭৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৭৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৮১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছোটনাগপুর অঞ্চলের উপজাতিদের কয়েকটি বিদ্রোহ, ১৮০০ খৃষ্টাব্দের নীল চাষীদের বিদ্রোহ, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সুদূর প্রসারিত সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ করতে পারি, যে বিদ্রোহী সৈনিকরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রীড়নকে পরিণত মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহকে তাঁর নিজ গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল।

একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যদিও বিরতির মাঝে মাঝে সারা শতাব্দী জুড়ে জনসাধারণের মধ্যে এই ধরণের আন্দোলনের স্রোত বয়েছিল, সমাজে ধনী অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই আন্দোলনে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি।

তাঁরা যে শুধুমাত্র এর থেকে দূরে রয়েছেন তাই নয়, সমসাময়িক সংবাদ-পত্রগুলি পড়লে দেখা যায় যে, তাঁরা এই বিদ্রোহগুলিকে শান্তি ও অগ্রগতির পথে বিঘ্নস্বরূপ মনে করে বিচলিত হয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের ভার কার হাতে গেল, সে চিন্তার চেয়ে দেশের শান্তি ও প্রগতিকে তাঁরা বড় করে দেখেছেন।

অবশ্য কিছু কিছু উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁরা শ্রমজীবী ও চাষীদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাঁদের

স্বপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন এবং সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত বিপদও বরণ করেছেন।• দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী মূর্ত হয়ে ওঠে। এই নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার অপরাধে রেভারেন্ড লংয়ের বিচার এবং কারাদণ্ড হয়েছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শশিপদ ব্যানার্জী "ভারত শ্রমজীবী" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখের সহযোগিতায় ইনি ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন তৈরী করেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক আসামের চা বাগানে গিয়ে, সেখানকার শ্রমিকদের জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে আনেন এবং "স্লেভ ট্রেড ইন আসাম" (আসামে দাস ব্যবসা) নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

এই ধরনের উদাহরণ দুর্লভ এবং কখনও এগুলি পরিপূর্ণ জন-আন্দোলনে রূপায়িত হতে পারে নি বলে যদি এই উদাহরণগুলিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যায় যে মোটের উপর ব্যাংলার সহরবাসী শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক এষণা নিজেদের বিশিষ্ট স্বার্থ অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হয়। এগুলি বিশেষভাবে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে রচিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও বিশেষভাবে উদীয়মান মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সহিত সমকক্ষ হিসাবে ব্যবহার দাবী করা এবং সেই সঙ্গে কোনও এক ধরণের পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হোক তাই চাওয়া। অন্যান্য দাবীর মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংস্কার এবং শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতিও ছিল। কৃষক, শিল্পজীবী, উপজাতিবৃন্দ, যাদের নিয়ে দেশের তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা গঠিত, তাদের স্বার্থ অপেক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অসুবিধাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে সেগুলির অপসারণই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শিক্ষিতদের মধ্যে নিজ মনোভাব জ্ঞাপনের বা তার প্রচারের সুযোগ ছিল বটে, কিন্তু সোজাসুজি ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ স্থান ছিল না।

এইভাবে নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের স্বার্থের মধ্যে গভীর পার্থক্য এসে যাওয়ায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ দেশের রাজশক্তির পক্ষ অবলম্বন করায়, গ্রামাঞ্চলে থেকে থেকে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলে উঠেছিল, তা নতুন রাজশক্তির নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে নি।

আগেই বলা হয়েছে যে ধর্ম, সমাজ সংস্কার অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব দেখা গিয়েছিল। একদলের কাছে পাশ্চাত্ত্য-ভাবধারার ইংরেজী রূপ বিশেষ আদরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য দল প্রাচীন ভাবধারার প্রতি আস্থা স্থাপন করে অনুরূপ উৎসাহের সঙ্গে অতীতকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। হয় পাশ্চাত্ত্যবাদ নয় ভারতীয়বাদ। এই অপ্রতিহত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করবার প্রথম প্রয়াসের মধ্যে মুসলমান অথবা ইয়োরোপীয় বিজেতাদের প্রচলিত মূল্যবোধ বা ভাবধারার উৎস থেকে নানা উপাদান নির্বাচন ও আহরণ করে এক নতুন ভাবধারা প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায়। এমন কি হিন্দুধর্মকেও এই মূল্যবোধের ছাঁচে ঢালাই করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই চেষ্টার গভীরে অন্তর্নিহিত ছিল হিন্দু সভ্যতার প্রচলিত রূপের প্রতি অশ্রদ্ধা। মন যতক্ষণ না হীনমন্যতার আত্মগ্লানি থেকে মুক্তিলাভ করে, ততক্ষণ কোন সংস্কৃতির পক্ষেই সৃষ্টিশীল অবস্থায় পৌঁছান শক্ত।

এই সময়ে, ব্রাহ্মসমাজের দিক্ থেকে সমাজসংস্কারের চেষ্টা ছাড়াও হিন্দুসমাজের ভেতর থেকে সমাজ তার আত্মরক্ষার অস্ত্র গড়ে তুলছিল। রাধাকান্ত দেব অথবা ভবানীচরণের ন্যায় রক্ষণশীল নেতারা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির যে উৎস রয়েছে, তাকে শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে সহজ লভ্য করে দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থাংশে এবং শেষ ভাগে ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য পক্ষপাতিত্বের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রতিভাশালী লেখক অথবা শশধর তর্কচূড়ামণির ন্যায় বক্তা হিন্দুধর্মকে তার নিজস্ব মূল্যের ভিত্তিতে স্থাপন করার চেষ্টা করেন। তার জনপ্রিয় নাট্যকারেরা একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজের 'বাড়াবাড়ি' নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুক রচনায় প্রবৃত্ত হন, অন্য দিকে একই সঙ্গে তাঁরা উগ্র জাতীয়বাদের বীজ বপন করেন।

প্রায় এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারত জুড়ে তাঁর রাজনৈতিক সফর আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং সংগঠন ক্ষমতার দ্বারা দেশের শিক্ষিত জনতার মধ্যে যে অসন্তোষের ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে সংহত করে ধর্মনিরপেক্ষ এক নতুন দিকে মোড় ফিরিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ, সংগঠনের যে আদর্শ তিনি যুবকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তার উৎস ছিল পশ্চিমে, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, কিংবা আইরিশ অথবা রাশিয়ান বিপ্লবীদের উদাহরণ তিনি দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের যে রাজনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত হয়েছিল, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজের নব সংস্কৃত

সংস্করণ অপেক্ষা প্রাচীন রক্ষণশীল বিশ্বাস ও আচারের প্রতিই তার ঝোঁক দেখা গিয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এই সময় সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য যে গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল, তার সভ্যদের তরোয়াল দিয়ে নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর করে সভ্য তালিকা-ভুক্ত হতে হত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও যে প্রতিষ্ঠানের কথা বর্ণিত আছে, তার সভ্যরাও ধর্মের ভাব নিয়ে দেশোদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। এমন কি বিংশ শতাব্দীর পুরোভাগে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী দলগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যেও দুর্গা বা কালী স্বাধীন ভারতের উপাস্য দেবী এই বিশ্বাস দেখা যায় এবং তাঁরা অনেকেই ভগবদ্গীতাকে বিপ্লবের পথে আত্মার সহায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রায় শতাব্দী জুড়ে দেশের রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল উভয় দলের নেতাদের মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহারের ফলে বাংলার শিক্ষিত জনতা সংস্কৃত এবং মাতৃভাষায় নিবন্ধ দেশের প্রাচীন চিরাচরিত চিন্তাধারা এবং সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করেছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের পূর্বে এ বস্তু শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার অবাধ প্রচারের ফলে দেশে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য, নির্বাচিত উপাদানে গঠিত ভারতের নবীন সংস্কৃতি অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতার অতীত মহিমার প্রতিই দেখা যায়। নির্বাচিত পাশ্চাত্ত্য উপাদানে গঠিত হিন্দু সংস্কৃতির নব সুসংস্কৃত রূপ জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত ভাবের অনুকূল না হওয়ায় হিন্দুধর্মকে নতুন করে বোঝবার ও স্থাপন করবার প্রয়োজন বোধ জেগেছিল, যে হিন্দুধর্মকে ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম অথবা ইয়োরোপীয় মূল্যবোধের কাছে মনে মনে নতিস্বীকার করতে না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষা এবং আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ভিতর দিয়ে এই চাহিদার পরিপূরণ সম্ভব হয়েছিল।

সারা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার জীবনে নানা পরিবর্তনের ধারা চলেছিল, কিন্তু পল্লীজীবনের অন্তঃস্থলে চিরাচরিত ধর্মভাবের বহমান স্রোতকে তা স্পর্শ করে নি। প্রায় নিরক্ষর সহজ পল্লীবাসীদের একান্ত নিজস্ব যে কবি ও ভক্ত পরম্পরা চলে এসেছে, তাঁদের হৃদয়ের জাগ্রত সত্যরূপে এই ধর্মভাব কাল থেকে কালান্তরে চলে এসেছে। এই অবস্থা যে শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়, সারা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য এবং একদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের মূল-

সূত্র এইখানে। যখন অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত জনগণ দলে দলে ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে তাদের পল্লীগ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে সেখানকার নতুন পরিবেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবন ধারার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যে হারিয়ে গেছে, তখন অন্য দিকে পল্লী অঞ্চলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষীণ ধারা বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাত্রা ও কবিগানের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। ইংরাজ শাসন ও বাণিজ্য ব্যবস্থা সুদূরতম পল্লীরও অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল বটে, কিন্তু পল্লীবাসীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের মাঝেও ধর্ম বা ভক্তিভাবের ধারা অপ্রতিহত গতিতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মানুষ। তাঁর রচিত রামপ্রসাদী সংগীত সাধারণ পল্লীবাসীর কাছে বিশেষ আদরণীয় হয়ে ওঠে। সহজ সরল ভাষায় রচিত তাঁর প্রতিটি সংগীতের মধ্যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা এবং ঈশ্বরের মাতৃরূপের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি মর্ম স্পর্শ করে। কিন্তু মোটের উপর এই গানগুলি শিক্ষিত নগরবাসীদের মধ্যে বিশেষ স্থান পায় নি, কারণ তার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে সাকার আরাধনার কথা, যে সাকার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা জ্ঞানে তাঁরা বর্জন করতে চেয়েছেন। বাংলার শিক্ষিত সমাজ, ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবতার ভাবে পূর্ণ নিরাকার-বাদকে ধর্মরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছে, তাতে থাক না থাক কোন প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস।

পল্লীবাসী, প্রায় নিরক্ষর রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) যখন শহরের শিক্ষিত যুবকদের কাছে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন, যখন তিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, হ্যাঁ তিনি দেখেছেন, কথা বলেছেন, যেমনভাবে তিনি প্রশ্নকারীকে দেখছেন বা তার সঙ্গে কথা বলছেন, তখন শিক্ষিত সমাজে এক আলোড়ন জেগেছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর হয় তো বিশেষ ছিল না, তবে শিশুকাল থেকেই রামকৃষ্ণ তাঁর গ্রামের পথ দিয়ে যে সব সাধু মাহাত্মারা দক্ষিণাভিমুখে তীর্থযাত্রা করতেন, তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। ষোল বছর বয়স থেকে তিনি কালীবাড়ীতে বাস করতে আরম্ভ করেন। হিন্দুধর্মের নানা উপাখ্যান থেকে অভিনীত যাত্রা, রামপ্রসাদী গান, কথকতা বা বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম অবদানের যা কিছু অবশিষ্ট তখনও ছিল তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দুধর্মের সাধনার বিভিন্ন পথ প্রচলিত আছে। রামকৃষ্ণ একে একে প্রতিটি দুর্গম পথের দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম এবং খৃষ্টধর্মের পথ দিয়ে লক্ষ্যের

সন্ধানে এগিয়ে চলেন এবং লক্ষ্যে উপনীত হয়ে দেখেন যে লক্ষ্য একই। আপন উপলব্ধির ভেতর দিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন নদীর ধারা যেমন শেষ পর্যন্ত একই সাগরে গিয়ে মেশে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের বিচিত্র সাধনার পথে মানুষ সেই একই লক্ষ্যে উপনীত হয়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যত মত, তত পথ। এইভাবে হিন্দুধর্মের নিগূঢ়তম সত্যকে তিনি নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। হিন্দুধর্মের অধিকারবাদ বলে কোন দু'জন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এক নয়, প্রত্যেকের প্রয়োজন স্বতন্ত্র এবং সেই অনুসারে তার স্বধর্ম পৃথক্। জগতে যত লোক, তত ধর্মমত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় খৃষ্টধর্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের (বৈদিক অথবা উপনিষদের ধর্ম) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সকল ধর্মই সমান। কোনও এক ধর্ম অন্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেয় কিংবা হেয় নয়। প্রত্যেককে নিজের বিশ্বাসকে আশ্রয় করে অবিরত এগিয়ে চলতে হবে, যতক্ষণ না এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যেখানে ধর্মের ভেদ চলে গিয়ে মহান্ ঐক্যের মাঝে স্থিতি লাভ করা যায়। শেষ লক্ষ্য হল সকল গণ্ডীকে অতিক্রম করে অসীমকে উপলব্ধি করা। এ উপলব্ধি শুধুমাত্র সত্যকে বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার নয়, তাকে জীবনের মধ্যে পাওয়া।

পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে অনাস্বাদিতপ্রায়, হিন্দুধর্মের এই অমূল্য ভাবকে আশ্রয় করে, এই আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টার মধ্যে ভারতবাসী এক নব জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে পায়। হিন্দুধর্মের এই পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দেশবাসী গৌরবান্বিত বোধ করবার এবং জাতীয়তা বোধকে জাগ্রত ও বর্ধিত করবার অবকাশ লাভ করে।

বিবেকানন্দ যুগ

শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে যাঁরা নতুন করে গঠন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবন্ত স্বদেশপ্রেম, নিপীড়িত, পদদলিতদের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ও অনুরাগ, সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উদার মনোভাব এবং তাঁর তেজস্বী বলিষ্ঠ চরিত্রের দ্বারা দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভারত তার অতীতের মহত্ত্ব, প্রাচীন গৌরব হারিয়ে অধঃপতনের চরমে এসে পোঁছেছে, স্বামীজী তা ভালভাবেই বুঝেছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি আশা হারিয়ে নিরুদ্যম হন নি, বরং বলেছেন, "শক্তিমান্ বৃক্ষ পক্ক ফল উৎপাদন করে, সেই ফলটি ভূমিতে পতিত হয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পচিয়া যায়, সেই ধ্বংস হইতেই ভাবী বৃক্ষের অংকুরোদ্গম হয় এবং সম্ভবতঃ তাহা প্রথম বৃক্ষটি অপেক্ষাও শক্তিমান্ হয়। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। এইরূপ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ ভারত জন্মলাভ করিবে"।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দেশের এই অধঃপতনের প্রধান কারণ সংকীর্ণতা যা ধ্বংস ও দুর্বলতার রূপে সারা জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার মনে হয় ভারতের দুর্গতি ও অধঃপতনের প্রধান কারণ জাতিভেদ, যাহার মূল কারণ হইল জাতিতে জাতিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ......নিজে দুর্গত না হইলে অপরকে কেহ ঘৃণা করে না"।

"যখন জাতির চেতনা দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন সকল রোগের জীবাণু জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তির সকল ক্ষেত্রেই প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে"।

সমাজের ও দেশের অবস্থা দেখে তিনি বলেন, "পৃথিবীতে কোন ধর্ম হিন্দুধর্মের ন্যায় মানবতার মহিমা এইরূপ উচ্চভাবে ঘোষণা করে নাই, আবার পৃথিবীর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীকে এভাবে পদদলিত করে নাই"।

"তোমাদের ধর্ম জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথচ তোমরা নিম্নশ্রেণীর মানুষকে কিছুই দান করিতেছ না। তোমাদের ধর্মে অনন্ত উৎস প্রবাহিত অথচ তোমরা লোককে পয়ঃপ্রণালীর বারি দান করিতেছ"।

চিকিৎসক যেমন প্রথমে রোগীর রোগ ও তার কারণ নির্ণয় করেন, তারপর কিভাবে তাকে রোগমুক্ত করা যায় সেই চেষ্টা করেন, সেইরূপ স্বামীজী

আমাদের জাতীয় জীবনে যে ব্যাধি প্রবেশ করে পঙ্গুতার পথে, ক্ষয়ের পথে নিয়ে চলেছিল, প্রথম তা নিরূপণ করে কিভাবে আমাদের এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে হবে, তার কথা বলেছেন এবং তার জন্য চেষ্টা করেছেন।

তাঁর সত্য দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয় যে, ভারতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম, যে ধর্মের চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং যা ব্যক্তি-সত্তার শ্রেষ্ঠত্বের শিক্ষা দেয়। তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর স্বদেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকে জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, রাজনীতি বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, পরন্তু আমি ইহাই বলিতেছি যে, উহা এখানে গৌণ এবং ধর্মই মুখ্য"!

"তোমরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে ধরিয়া থাকিবে। তারপর অপর হস্তটি প্রসারিত করিয়া অপর জাতির নিকট যাহা কিছু প্রাপ্ত হও গ্রহণ করিবে, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই জীবনে একটি আদর্শের অনুগামী হইবে"।

ধর্ম স্বামীজীর কাছে শুধুমাত্র বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানই নয়, ধর্ম তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং অভয় ও জীবনের সকল কাজের মধ্যে অনুস্যূত। জীবনসংগ্রামের পথে ধর্মের বর্ম বুকে বেঁধে এগিয়ে যেতে হবে।

সে সময়কার সমাজে প্রাচ্যবাদ বা পাশ্চাত্ত্যবাদের যে সামাজিক দ্বন্দ্ব চলেছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে আমাদের এই পথে দুইটি প্রধান অন্তরায়, ইহা একটি উভয় সংকট অবস্থা; একটি হইল পুরাতন গোঁড়ামির প্রতি গভীর আসক্তি ও অপরটি হইল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ"। শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারা কখনও উন্নতি সম্ভব নয় এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। "অনুকরণ সভ্যতা নহে, কাপুরুষের অনুকরণ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হয় না। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিও না যে আহার-বিহার ও আচার-ব্যবহারে পরানুকরণ কখনও ভারতের পক্ষে মঙ্গলের হইবে। অপর পক্ষে অনেক শিক্ষিত ভক্ত আছেন, যাঁহারা এক প্রকার বাতিক-গ্রস্ত—দর্শনশাস্ত্রের বাতিক এবং প্রভুই জানেন এই অদ্ভুত জাতির অদ্ভুত ঈশ্বর ও অদ্ভুত গ্রাম্য কুসংস্কার সম্পর্কে আর কত প্রকার বালসুলভ ব্যাখ্যাই না আছে। প্রতিটি তুচ্ছ গ্রাম্য কুসংস্কার তাহাদের নিকট বেদের নিদর্শনের ন্যায়"।

যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের স্বার্থ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থ পৃথক্ থাকবে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় যতদিন না আপনার করে নিয়ে তার নিরসনের চেষ্টা করবে, ততদিন দেশের উন্নতি আসবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে স্বামীজী বলেন, "তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিগণ নিম্নশ্রেণীকে স্পর্শ করিবে না অথচ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাহাদের অর্থই শোষণ করিতেছ......চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের শ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতেছ। প্রত্যেক দেশেরই এই অবস্থা। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ এ বিষয়ে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। ভারতবর্ষেও এই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বর্তমানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যাধিক্য হইতে ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে। যতই চেষ্টা করুক আর উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্ন-শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। নিম্ন শ্রেণীর প্রাপ্য অধিকার দানের মধ্যেই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর মঙ্গল"।

"যতদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্ষুধার্ত ও অজ্ঞ থাকিবে, ততদিন প্রত্যেক মানুষকেই আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব, যাহারা তাহাদেরই অর্থে বিদ্যার্জন করিয়াছে অথচ তাহাদের জন্য কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে না। দীন-দরিদ্রকে শোষণ করিয়া তাহাদেরই অর্থে সগর্বে বিলাসিতা করিতেছে এবং এযাবৎ এই দুই কোটি নর-নারীর জন্য যাহারা কিছুই করে নাই তাহারাও বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত কি হইতে পারে"।

"আমার মনে হয় এই জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষাই একটি জাতীয় পাপ এবং ভারতবর্ষের পতনের ইহাই অন্যতম কারণ। কোন প্রকার রাজনীতিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, যতদিন না ভারতের জনগণের শিক্ষা ও খাওয়া পরার পুনরায় সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে। তাহারা আমাদের শিক্ষাদান ও মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থদান করিতেছে অথচ পরিবর্তে পাইতেছে পদাঘাত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমাদের দাসত্ব করিতেছে। যদি আমরা ভারতের পুনরুত্থান কামনা করি, তবে তাহাদের জন্য কাজ করিতে হইবে"।

স্বামীজীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষার স্বাভাবিক উন্নতির ভিতর দিয়েই সংস্কার সম্ভব। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের সৌখীন উন্নতি প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন করেন নি। সমাজসংস্কারকদের তিনি বার বার বলেছেন, জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সমস্যা, তাদের অশিক্ষা, তাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশাকে প্রথমে উপলব্ধি করতে এবং এই দীন-দরিদ্র ও দুর্বলদের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে তাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে। তাঁরই কথাঃ—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে স্বামীজী সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করেছেন, "নারীগণের সমস্যা সমাধানের তুমি কে? নিরস্ত হও, তাহারা নিজেরাই তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবে। আমাদের কর্তব্য সমাজের নর-নারীকে প্রকৃত শিক্ষা দান করা, শিক্ষালাভের ফলেই তাহারা তাহাদের ভালমন্দ বুঝিতে পারিবে এবং শেষোক্ত বিষয়টি পরিত্যাগ করিবে"।

জনসাধারণের শিক্ষাসম্পর্কেও তিনি এই মতই পোষণ করতেন। যে সকল জাতি বংশানুক্রমে পদদলিত হয়ে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে আছে, তাদের মাঝে শিক্ষার আলোক তুলে ধরবার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, "যদি বংশানুক্রমিক ভাব সংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থ ব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্বলকে অগ্রে সাহায্য কর, কারণ দুর্বলের সাহায্য করাই অগ্রে আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ না হয়, তবে তাহাদিগকেই কেবল শিক্ষা দিতে থাক। তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষকসমূহ নিযুক্ত করিতে থাক। আমার ত ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে, ভারতের এই পদদলিত সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুনাও ও শিখাও যে সবল দুর্বল উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছে সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সাধু হইতে পারে"।

বিবেকানন্দ সকলের জন্য সমান সুযোগ চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজ-দর্শনের কেন্দ্র ছিল জনগণের মুক্তি, সে হিসাবে তিনি জাতীয়তাবাদের সীমাতেই আবদ্ধ থাকেন নি। তাঁর কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভেদ ছিল না, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের উভয়কেই নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করতে হবে এই ছিল তাঁর মত। মানবজাতির বিকাশের জন্য প্রতীচ্যের

যেমন আদর্শের প্রয়োজন আছে, প্রাচ্যেরও ঠিক তেমনই সে প্রয়োজন আছে, বরং আরো অধিক মাত্রায় প্রয়োজন আছে এই কথা তিনি বলে গেছেন। অতীতে কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করি নাই, আর তোমরা সকলেই জান, যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতে আজ ভারতের সর্বত্র যেন একটু স্পন্দন যেন একটু জীবন অনভূত হইতেছে—তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এক্ষণে ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ভূত কালে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখা গিয়া থাকে, তবে জানিও এক্ষণে মহাবন্যা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না" এই ছিল স্বামীজীর ভবিষ্যৎ বাণী।

স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে মার্গারেট নোব্‌লের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই আইরিশ মহিলা গভীর ত্যাগ, সাহস ও আত্মোৎসর্গের সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় স্বামীজী তাঁকে নিবেদিতা নামে অভিহিত করেন এবং এই নামেই তিনি সুপরিচিতা। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদীয়মান বাঙালী যুবকগোষ্ঠী তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, শিল্পী নন্দলাল বোস, সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা দীনেশচন্দ্র সেন, রাজনৈতিক নেতা অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ কোন না কোন সময় তাঁর সহিত আত্মিক যোগাযোগের ভিতর দিয়ে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নিবেদিতা যে শুধুমাত্র তাঁর গুরু স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি এবং রচনা-গুলিকে লিপিবদ্ধ এবং সংশোধন করেছেন তাই নয়, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ভ্রমণ বিষয়েও বহু পুস্তকাদি রচনা করেছেন। তিনি নিজে কলকাতায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করে তার পরিচালনা করতেন। তাঁর বাসস্থানের চারিদিকে যখন মহামারী আরম্ভ হয়, তখন তিনি একটি সেবাদল গঠন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত জনগণকে তাদের সুপ্তিমগ্ন জড়তা থেকে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁর নিজের দিক্ থেকে চেষ্টা ছিল ভারতীয় সভ্যতার রহস্য ভেদ করে, তাকে অতীতের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে, ভারতের নবোৎসারিত জাতীয় জীবনের সামনে উপস্থিত করা এবং

পশ্চিমের অতিমাত্রায় বহির্মুখিতার সংশোধন হিসাবে প্রাচ্যের অন্তর্মুখী প্রশান্তির উপলব্ধিকে তুলে ধরা।

ভারত এবং পশ্চিম উভয়ই নিজ নিজ বিশিষ্ট ধরনের গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। স্বামীজী এবং নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশকে তাদের স্বরচিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, যাতে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে সারা মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।

রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত একই শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন ধারায় সংস্কারমূলক আন্দোলন চলেছিল।

সারা শিক্ষিত সমাজ জুড়ে কখনও শহরে কখনও বা গ্রামে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে, চিন্তার জগতে, ধর্মবিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর নানা স্ফুরণ দেখা গেছে। একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ সক্রিয়ভাবে কাজ করে গেছে, অন্যদিকে হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে নানা সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে উঠেছে যা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং কোন বিশেষ দলের বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়।

সারা দেশে যেন এক নব জাগরণ এসেছিল। এক-এক সময় এক-একটি আন্দোলন আপেক্ষিকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোনটির সঙ্গে কোনটির প্রতিযোগিতা দেখা দেয় নি। আসল কথা জনতার মানসিক স্থিতি অনুসারে এক বা অন্য আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এই মানসিক স্থিতি গড়ে উঠেছে কখনও বা কোন শক্তিমান্ নেতা বা বক্তার প্রভাবে, কখনও বা কোন বিশেষ রীতি-নীতি যা অধিকাংশের কাছে অন্যায় বলে প্রতীত হয়েছে, সেই অন্যায় থেকে মুক্তিলাভের তাগিদে। এমন কি যখন ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন অথবা সন্ত্রাসবাদী দলের ন্যায় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদেরও আপন আপন স্থায়িত্বের জন্য জনতার মানসিক সমর্থন বা মানসিক স্থিতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনগুলিকে দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, এই আন্দোলনগুলির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত অধিক সংখ্যক লোক এতে যুক্ত হয়ে নতুন জীবনধারা বা চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছে। এদের পৃথক্ এবং সংযুক্ত প্রভাবে বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি এবং নীতির জগতে এক নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, যে হাওয়াতে পাল তুলে দিয়ে বাঙালীর জীবনতরী বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর জগতের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজ গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাজা রামমোহন যে যুগের সূচনা করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যে যুগকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে যুগের পূর্ণতালাভ আগামী দিনের বাঙালীর জনমানসে অবশ্যই সম্পন্ন হবে।